শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী
শরৎ
সাহিত্য
ভবন

শ্রীসুবোধচন্দ্র সুর
(সুর এণ্ড কোং)

প্রথম মুদ্রণ

১১,

হত্যা-জ্ঞা
স্থ এডিশ
তা ৪

বাণীর একনিষ্ঠ সেবক—

শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়কে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী স

রূপায়িত করেছেন, চিত্রশিল্পী—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পরিচালনা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

('কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির' প্রতিষ্ঠাতা)

এক

মাঠের মাঝখান দিয়ে পথ।

আঁকা-বাঁকা সরু পথ···ধানের সময় তু'ধারের মাঠ দেখায় অতি সুন্দর। সে-সময় এই সরু পথের রেখা যায় হারিয়ে, পথিক অতি সন্তর্পণে মাঠের মাঝে ধানের উঁচু আইল ধ'রে এগিয়ে চলে।

কেবল আজই নয়, পথ সহজ করবার জন্যে দীর্ঘকাল ধ'রে গ্রামের লোকেরা এই পথেই যাতায়াত ক'রে থাকে। ওধার দিয়ে উঁচু একটা পথ আছে, যাকে সত্যিই পথ বলা চলে, এবং সেই পথ ধ'রেই গ্রামের গাড়ী ষ্টেশনে যাতায়াত করে। বর্ষার সময় যখন এইসব মাঠ জলে ভ'রে ওঠে, পথের

চিত্রাপিতা

চারদিককার এইসব বিরাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে অনেক অচেনা-অজানা লোককেও দেখা যায়। এত লোককে এই ছোট ষ্টেশনে নামা-ওঠা করতে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। এদের চাষী-গৃহস্থ ব'লে মনে হয়না, বরং শ্রমিক বলেই মনে হয়।

সোমেশ উৎকণ্ঠিত হয়—এখানে এইসব শ্রমিকরা কি করে? কোনও নতুন কল-কারখানা হয়েছে না কি?

সেইখানে দাঁড়িয়ে সোমেশ খানিকক্ষন ভাবে, তারপর পথ হাঁটতে সুরু করে।

অগ্রহায়ণ মাস। মাঠ ধানে ভ'রে উঠেছে, বাতাসে ধানের শীষগুলো নুয়ে পড়ছে—এদিকে-ওদিকে দোলা খাচ্ছে। ধান-ক্ষেতের পাখীরা সব দল বেঁধে ক্ষেতের ওপর ঘুরছে, গান গাইছে। আকাশের গায়ে দোলা খেতে-খেতে সূর্য্য উঠেছে মাথার ওপরে, শীতের রোদ—দুপুরেও নেহাৎ মন্দ লাগছিল না।

সোমেশ মাঠের সরু পথ দিয়ে চলে।

বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত পার হ'তে সময়ও লাগে বড় কম নয়। আগে এ-পথ পার হ'তে এত সময় তো লাগতো না। আজ প্রথম সোমেশের সন্দেহ জাগে, পথ কি বেড়ে গেছে? তার পরই হাসি পায়—পথ যা তাই আছে, তার দেহের শক্তি অনেক—অনেক কমে গেছে, তাই পথের দূরত্ব খুব বেশী বলেই ঠেকছে।

অনেকক্ষণ মাঠের ওপর চ'লে সে এবার পথে উঠলো।

চিরবাঞ্ছিতা

দু'পাশের জমিতে কেবল ধানগাছ—মাঝে পথটা একটু উঁচু, ধুলোভরা সাদা পথটা সর্পিল-গতিতে এঁকে-বেঁকে চ'লে গেছে গ্রামের দিকে…দূরে-দূরে দেখা যাচ্ছে গ্রামের সীমান্ত-রেখায় বড়-বড় গাছগুলো…পথ চলতে কৃষকদের সারিবদ্ধ খড়ের ঘরগুলো চোখে পড়ে।

ঝরঝরে তকতকে পরিষ্কার ঘরগুলো—বড় বড় গাছের ছায়ায় সুশীতল। তার ভেতর, বাড়ীর মেয়েদের কাজ করতে দেখা যায়।

চলতে-চলতে সোমেশ থমকে দাঁড়ায়, দেখে, কৃষক ফিরছে মাঠ হ'তে, ছায়াশীতল-গাছের তলায় বিশ্রাম ক'রে।

ঘর…ঘর…সুখময় ঘর।

সোমেশের মুখখানা হাসিতে ভ'রে ওঠে।

হ্যাঁ, এই ঘরের মায়াতেই বদ্ধ বাঙালী। কোথাও সে যেতে পারেনা। যেখানেই যাক্, ফিরে আসতে হয় তাকে নিজের ঘরে—তার আত্মপরিজনের মধ্যে। এইখানে সে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে চায়। দেশ-বিদেশে যে প্রবাদ আছে—'বাঙালীর ঘরমুখো টান'—এ-অপবাদ দূর করতে হবে, বাঙালীকেই।

মনে পড়ে, কবির বাণী:

'এই সব শীর্ণ শান্ত পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।'

মানুষকে মানুষ হ'তে হবে। ঘরের মোহ কোনোদিন মানুষকে মানুষ করতে পারেনি—পারবেও না। কবি তাই আঘাত ক'রে ব্যথা দিয়ে মানুষকে জাগাতে চেয়েছেন।

চিরপ্রার্থিতা

সোমেশ পথ চলে।

সকালবেলায় সে কলকাতা হ'তে স্নানাহার সেরে এসেছে। কলকাতায় আত্মীয়-স্বজন নাই থাক, 'পাইস-হোটেলের' কল্যাণে কোনোমতে স্নানটা সারতে পেরেছে সে, তার সঙ্গে খাওয়া তো বটেই। স্নানাহারের চিন্তা নেই বলেই সে ধীরে-সুস্থে চলতে পারছে, নিজের জন্যে ভাবনার দরকার তার নেই।

পথের বাঁকে দেখা মিললো এতক্ষণ পরে একজন লোকের, অতি সন্তর্পণে পায়ের জুতো-জোড়াটা হাতে নিয়ে সে পথ চলেছে।

সোমেশের সামনা-সামনি এসে সে থমকে দাঁড়ালো, সোমেশের দৃষ্টি তার ওপরে পড়লো। মুখখানা যেন চেনা-চেনা মনে হয়, অনেকদিন আগে একে সে যেন চিনতো! ছ'বছর আগে সে যে ত্রিলোচনকে দেখেছিল, এখন তার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হলেও, সোমেশ তাকে দেখে চিনতে পেরেছে।

ত্রিলোচনও দু-একবার তার পানে তাকালে, তারপর অত্যন্ত ব্যস্তভাবেই পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল।

দূরে মোটরের হর্ণ শোনা যায়।

বিস্মিত-চোখে সোমেশ সামনের পথের পানে তাকায়। পেছনে প্রচুর ধুলোয় পথ অন্ধকার ক'রে তীব্রবেগে একখানা মোটর ছুটে আসছে।

এখানে, মোটর ?

সোমেশ পাশ কাটিয়ে স'রে দাঁড়ায়...

সামনা-সামনি মোটরখানা এসে পড়ে।

চিরন্তনী

মোটরে তিনজন আরোহী, তার মধ্যে একটি মেয়ে, মুখখানা যেন চেনা মনে হয়। তার পাশে ব'সে মাথায় কাঁচা-পাকা চুল মাধব দাসকে সোমেশ কোনো দিনই ভুলতে পারবে না, তাই পলকের দৃষ্টিপাতেই চিনতে পারলে। আর, ওই মেয়েটি ?

বন···'বনানী।'

সোমেশ আশ্চর্য্য-চোখে চায়, এই কি বনানী? কিন্তু আর-একজন—সুদর্শন চেহারা এবং সুবেশধারী এই ছেলেটি—এর মুখ সোমেশের মনে পড়েনা।

মোটর চ'লে গেলেও ধুলোয় অনেকক্ষণ কিছু দেখা যায়না দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সোমেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আবার চলতে আরম্ভ করে।

দুই

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে কেবল গ্রামেরই নয়, গ্রামের লোকদেরও।

ছ'বছর আগেকার সিরাজপুরের সঙ্গে বর্ত্তমান এই সিরাজপুরের বিশেষ মিল আজ দেখা যায়না। সোমেশ তাই বিস্ময়ে চারদিকে তাকায়···সেইসব লোকদের খুঁজে ফেরে।

ছোট নদী যমুনা আজও বয়ে যাচ্ছে গ্রামের ওপাশ দিয়ে, কিন্তু সেই নদীর দুই তীরে বসেছে আজ কল-কারখানা। গ্রামের ধনা-মহাজন মাধব দাস সেখানে কল-কারখানা বসিয়েছেন—

চিরবাঞ্ছিতা

চিনির কল, চালের কল, রোপ-ফ্যাক্টরী প্রভৃতি অনেক-কিছু তৈরী হয়েছে, নদীর ওপারে চামড়ার কারখানা বসেছে, যুদ্ধের জন্যে সামরিক বহু দ্রব্য এসব জায়গায় উৎপন্ন করা হ'চ্ছে এবং সেসব বস্তু লরীতে রেলপথে কতক সহরে যাচ্ছে, কতক জলপথে নৌকোয় চালান যাচ্ছে। ওদিকে হয়েছে, প্যাকিংবাক্স তৈরীর কারখানা···করাত দিয়ে কাঠ-চেরার খস্‌খস্ শব্দ, মেসিনের শব্দ, লোকজনের কলরব ইত্যাদিতে আধখানা গ্রাম বেশ শব্দায়িত হয়ে উঠেছে।

চাষীপ্রধান গ্রাম—সিরাজপুর। যেখানে আজ কল-কারখানা এবং প্রকাণ্ড বড় কলোনী স্থাপিত হয়েছে, সেখানে ছিল জেলেদের ছোট-ছোট কুটিরশ্রেণী। সেখানে ছিল বহুকালের পুরোনো একটা বটগাছ, গ্রামের মেয়েরা ষষ্ঠিপূজো করতো তার তলায়। গাছের গোড়াটি ছিল বাঁধানো এবং প্রবাদ ছিল, ষষ্ঠিতলার সে-জায়গায় যে পা দেয়, সে নাকি মুখে রক্ত উঠে মরে। তখন এই বটগাছের একটি পাতা কেউ ভাঙতে পারতো না, এর শাখা-প্রশাখা ভেঙে পড়লে, একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কোনো জাত তা স্পর্শ করতে বা জ্বালাবার অধিকারী হতোনা।

অথচ গ্রামের দুষ্টু ছেলে সোমেশ কতদিন সে গাছের ডাল ভেঙেছে, ষষ্ঠিতলায় উঠেছে। যা-কিছু করতে বারণ করা হতো তাই সে আগে ক'রে বসতো।

এসব সম্বন্ধে তাদের উপদেষ্টা ছিল, পরেশ দাস—মাধব দাসেরই সম্পর্কীয়-ভ্রাতুষ্পুত্র। তাকে গ্রামের সকল ছেলেই মেনে

চলতো এবং যা-কিছু অন্যায়-অসঙ্গত তাই করেই তারা আনন্দ উপভোগ করতো।

আজ সে বটগাছও নেই, ষষ্ঠিতলাও নেই। যুদ্ধের চাহিদা মেটাতে, সামরিক-প্রয়োজনে সে সব গেছে। দেখা গেছে, মাধব দাসের কোনো অনিষ্টই হয়নি, বরং দিন-দিন তাঁর উন্নতিই হ'চ্ছে। ওপাশের চাষীগ্রাম, সোনাপুরের অস্তিত্ব আজ খুঁজে পাওয়া যায়না···দেশ-বিদেশের কত লোক এই গ্রামের ওধারে বাস করছে। তারা কলের শ্রমিক, গ্রামের শুভাশুভ তাদের লক্ষ্য স্থল নয়, তারা সাময়িব-প্রয়োজনে এসেছে মাত্র, গ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। তাদের জন্যে সারি-সারি বাস করবার ঘর তৈরী হয়েছে, কলোনীতে পাকা পথ, বহু টিউবওয়েল স্থাপিত হয়েছে। যেখানে ছিল একদিন সবুজের রাজত্ব, সেখানে আজ ঘরবাড়ী কারখানা-কলের একাধিপত্য···দেখা যাবে শুধু চিমনীর কালো কালো ধোঁয়া, আর টালির লম্বা-লম্বা কতকগুলো ঘর।

ওইধারটাতেই যমুনার তীরে ছিল পরেশ দাসের মস্ত বড় বাড়ী, সেটা হয়েছে হসপিটাল। কয়েকজন বেতনভোগী ডাক্তার এবং নার্শও সেখানে আছে। হসপিটালের পাশে ডাক্তার ও নার্শদের কোয়ার্টারও সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের শক্তির, বুদ্ধিমত্তার পরিচয়···শুধু তাই নয়, মানুষের হৃদ্ধতার পরিচয়—আরও চাই, আরও চাই—অর্থ, যশ, মান— মানুষ আরও চায়।

সোমেশ ঘুরে বেড়ায়।

চিত্রাঙ্কিতা

কল-কারখানার প্রয়োজনীয়তা আজ সে অস্বীকার করবে না। একমাত্র মাটি চাষ ক'রে মানুষ কোনোদিন উন্নতি করতে পারবে না। বর্ত্তমান যুগ এনেছে, অনেক-কিছু…চাহিদা আজ সব-কিছুরই অত্যন্ত বেশী। সোমেশ আদিম যুগ হ'তে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত আলোচনা করে…মানুষকে এগিয়ে যেতেই হবে…একভাবে জীবন চালানো সম্ভব নয়। খাদ্য উৎপন্নের জন্যে একদল লোক থাক, তাই ব'লে সকলেরই সেদিকে আকৃষ্ট হ'তে গেলে, অন্য জিনিসের চাহিদা মেটাবার ভার নেবে কে ?

. হ্যাঁ, একথা সত্যি—পূর্ব্ব যুগে মানুষ সুখী ছি… অতি অল্পে তাদের অভাব মিটতো, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে প্রতি… দে অভাব। এই অভাবের পীড়নেই মানুষ বার হয়ে পড়েছে …নের সন্ধানে, যা পেলে অন্ততপক্ষে খানিকটা অভাবও দূর …তে পারে। সেইজন্যেই আজ চাই, কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতি। বুজ মাঠে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ না থেকে তাই ছড়িয়ে পড়েছে, দিগন্তরে। এ…র মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকা যে আজ চলবে না, তা অনেক ঠেকে এরা বুঝেছে।

আট ন'বছর আগেকার কথা।

তখনকার দিনটা ছিল, রাজনৈতিক-ষড়যন্ত্রের যুগ। সোজা-কথার, স্বদেশী-কাণ্ডের যুগ। গণ্ডীর এদিক হ'তে ওদিকে পা বাড়াটাই ছিল অপরাধের এবং এই দেশসেবা-ব্রত পালন করার অপরাধে বড় কম ছেলে তখন জেলে যায়নি।

বারো-তের বছর আগে পরেশ যখন কলকাতার কলেজে

পড়ছিল, তখনই সে দেশসেবা-ব্রত গ্রহণ করেছিল। সে-ই আবার এই মন্ত্র দিয়েছিল শুধু সোমেশকে নয়—অনেক ছেলেকে।

নির্য্যাতিত-ভারতের মুক্তিসাধনার সাধক ছিল তারা। তারা স্বপ্ন দেখতো স্বাধীন-ভারতের এবং নিজেদের তারা সগর্ব্বে মুক্তিফৌজ নামে পরিচয় দিত। গ্রামে ছিল, সোমেশ এবং সহরে ছিল, পরেশ। গ্রামের তরুণদের মধ্যে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করেছিল, সোমেশ এবং মাঝে-মাঝে সভা-সমিতির আয়োজন ক'রে সে বিখ্যাত দেশ-নেতাদেরও দু-একজনকে এনেছিল।

তারপর সোমেশকে আইনের প্যাঁচে একদিন জড়িয়ে প'ড়তে হয়েছিল। শেষে ডাকাতি-মামলায় জড়িয়ে প'ড়ে দীর্ঘ দিনের জন্যে তাকে জেলে যেতে হলো।

রাজদ্রোহী সোমেশ।

একদিন নয়, দু'দিন নয়, দীর্ঘ সাতবছর কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে জেলে বাস্ ক'রে সম্প্রতি সে মুক্তি পেয়েছে।

মুক্তি পাওয়ার পর পাঁচ-সাতদিন সে কলকাতায় তার ডাক্তার-বন্ধু সুজিতের কাছে ছিল, সেখান হ'তে সম্প্রতি বাড়ী আসছে।

পরিত্যক্ত বাড়ী—আটবছর সে বাড়ী ছাড়া।

যখন সোমেশ জেলে যায় তখন তার স্থবীরপ্রায় পিতা বর্ত্তমান ছিলেন। এই ছেলেটি ছাড়া তাঁর জগতে আর কেউ ছিলনা। মায়ের কথা সোমেশের মনে পড়েনা, এক মাসের ছেলে সোমেশকে রেখে তিনি মারা গেছেন, পিতাই তাকে মানুষ করেছিলেন।

চিরবাঞ্ছিতা

ম্যাট্রিকে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে সোমেশ বৃত্তি লাভ ক'রে কলকাতায় পড়তে গিয়েছিল। পিতা, পুত্রকে শিক্ষা দিতে নিজের জমিজমা বিক্রয় করেও খরচ দিয়েছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক-আবর্ত্তে প'ড়ে সোমেশের পড়াশুনো মোটেই অগ্রসর হয়নি, আই-এ পাস সে হয়নি।

সেই পিতার অসুস্থ সংবাদ সোমেশ দমদম-জেলে থাকার সময় পেয়েছিল। তারপর চললো কত-না আবেদন-নিবেদন··· একবার মুমূর্ষু পিতাকে দেখবার জন্যে তার সে কি আকুতি! কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায়নি। তার ভীষণ অপরাধের জন্য তাকে একদিনের জন্যও মুক্তি দেওয়া নাকি সম্ভবপর হয়নি। এরপর সে গেল, দমদম হ'তে মেদিনীপুর, তারপর গেল, বক্সারে।

দীর্ঘ আটবছর পরে সে নিজের গ্রামে ফিরেছে।

বাড়ীতে আছে বহুপুরাতন ভৃত্য, হারাধন।

স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সে একটিমাত্র মেয়ের বিবাহ দিয়েছে কাটোয়াতে, দুনিয়ায় তারও আর কেউ নেই। মেয়ে তাকে কতবার নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছে, কিন্তু হারাধন এখান হ'তে এক পাও নড়তে পারেনি।

আজও হারাধন আছে।

সামনের ঘর দু'খানা প'ড়ে গেছে, ভেতরের ঘর ক'খানা তার যত্নে কোনোরকমে আজও টিকে রয়েছে।

এইখানেই আশ্রয় নিয়েছিল, পরেশ দাস ও বরুণা।

পরেশের সঙ্গে যখন বরুণার বিবাহ হয়েছিল তাই মাত্র বরুণাকে একবার মাত্র সোমেশ দেখেছিল, তারপর তার কথা সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল।

পরেশ ও সোমেশ একটা মামলায় জেলে গিয়েছিল। দমদমে ছ'টি মাস তারা একসঙ্গে থাকতে পেরেছিল, তারপর সোমেশকে পাঠানো হয়, মেদিনীপুরে. পরেশের আর কোনো সংবাদই সে পায়নি। তারপর দীর্ঘ সাতবছর পরে পরেশের সঙ্গে দেখা হলো এই গ্রামে ফিরে এসে।

সাতবছর আগে যে পরেশকে সে পাশে পেয়েছিল, এ যেন সে পরেশ নয়, এ তার ছায়া মাত্র···কয়েকখানা, হাড়ের ওপরে চামড়ার আচ্ছাদন। মাথার চুলগুলো উঠে গেছে, গালের দু'দিকে হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, সেই হাড়ের মাঝখানে নাকটাকে দেখা যায়—খাঁড়ার মত উঁচু হয়ে সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। সামনের দাঁতগুলো তার স্বভাবতই বড় ছিল, সেগুলো যেন আরও বড় দেখায়, তাদের মধ্যেও সামনের দুটি অনেক আগে বিদায় নিয়েছে। এ-দুটি দাঁত ভাঙার ইতিহাস সোমেশ জানে। বন্দীদের ওপর ভালো ব্যবহার না করার ফলে যখন সকলে অনশন-ব্রত গ্রহণ করেছিল, তখন তাদের খাওয়ানোর জন্যে মিষ্টি ব্যবহার নয়—সাধারণে প্রকাশিত যে সদয় ব্যবহার করা হয়েছিল, তার মধ্যে একটি ছিল, জোর ক'রে হাঁ করিয়ে মুখের মধ্যে খাবার ভ'রে দেওয়া। এই প্রচেষ্টার ফলে পরেশের দুটি দাঁত সমূলে বিদায় নিয়েছে,

তার পাশাপাশি কয়েকটাও বর্ত্তমানে বিদায় নেবার চেষ্টায় আছে।

সবই গেছে, শুধু আছে তার সেই দুটি চোখ।

কোটরাগত—কিন্তু জ্বলন্ত দুটি আগুন। দেহের শক্তি যত কমছে, মনের শক্তির সঙ্গে তার চোখের আগুনও তত বাড়ছে।

সোমেশকে সে দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলে—"অ্যাঁ, বেঁচে আছো সোমেশ, আজও জগতে বর্ত্তমান আছো তুমি? মরোনি?"

সোমেশ হাসলে—"না পরেশদা, আজও মরিনি। মরণও আমায় দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। মরণকে জয় করেছি —এখন মরলে তো চলবেনা, জগতে এখনও যে অনেক কাজ বাকি আছে, ঐইতো সবে নবীন-ভারতের সূত্রপাত! আগে সেদিন আসুক, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে মরা যাবে।"

পরেশ তাকে বসতে দিলে। একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "হ্যাঁ, অনেক বাকি—এখনও অনেক বাকি। কেবল পূবে ফরসা হয়ে উঠছে, এখুনি সূর্য্য উঠবে, আকাশের কোল লাল হয়ে উঠেছে। না, মরলে আমাদের এখন চলবে না। আমাদের বাঁচতে হবে—বাঁচতেই হবে।"

বলতে-বলতে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে ডাকে, শুনে যাও বরুণা, নতুন আশার বাণী শুনে যাও—আশা ছেড়োনা, হাল ধ'রে থাকো, নৌকো তোমার ভেসেই চলবে—ডুববে না। আমরা বাঁচবো, নিশ্চয়ই বাঁচবো, এমন ক'রে নিঃশেষে আমরা ফুরোতে পারিনা।"

চিরন্তনী

বারান্দার ওধারের ঝাঁপের দরজাটা ঠেলে যে মেয়েটি নম্র-পায়ে এসে সামনে দাঁড়ালো, তাকে সোমেশ যেন কোনো-দিনই দেখেনি। রোগা লম্বা একটি তরুণী, গায়ের বর্ণ তার গৌর নয়, রীতিমত শ্যাম। পরনে তার অত্যন্ত সাদা-সিদে মোটা একখানা শাড়ি, একটা সেমিজ—কেবল আধময়লাই নয়, তাতে কত জায়গায় তালি আর কত জায়গায় সেলাই, একবার চাইলেই তা দেখা যায়। গায়ে সোনার আঁচড়টুকু নেই, প্রকোষ্ঠে শুধু ছুটি শাঁখা আর আয়তির চিহ্ন একটি লোহা আছে বাঁ-হাতের কব্জিতে।

এই বরুণা—পরেশের স্ত্রী।

ছু'খানা হাত সে কপালে ঠেকিয়ে সোমেশের পানে বিস্মিত-চোখে চেয়ে রইলো।

পরেশ উদ্বেলকণ্ঠে বললে, "জানো বরুণা, আমরা বাঁচবো। কারও সাহায্য না নিয়েই বাঁচবো। তোমার ওই তুলসীপাতা আর ব্রাহ্মীরসের দরকার হবেনা আমাকে সুস্থ ক'রে তুলতে, তোমার ওই সিঁথির লাল সিঁদুরই যে আমার আয়ুরেখাকে বাড়িয়ে তুলবে—তাও নয়। না, মরা আমাদের হবেনা—মরলে আমাদের চলবে না আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। বুঝলে? উঃ, খালি দাগ মেপে-মেপে ওষুধ খাইয়ে আর রোগীর মত আমার সঙ্গে ব্যবহার ক'রে তোমরা আমায় সত্যিই মেরে ফেলবার যোগাড় করেছো।"

সোমেশ, বরুণার পানে চেয়ে-চেয়ে সাতবছর আগেকার একটি দিনের কথা মনে করতে চেষ্টা করে···

বিবাহস্থলে পরেশের পাশে নববধূ বরুণা।

চিত্রাঙ্গদা

ধনীর মেয়ে—সংসারে এক মা ছাড়া আর কেউ ছিলনা। পরেশের হাতে মেয়েকে দিয়ে মা পরম শান্তির নিশ্বাস ফেলে যাত্রার আয়োজন করলেন। কিসেই-বা কম পরেশ! ইউনিভার্সিটির শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিল সে···একে-একে সব ডিগ্রি ক'টাই সম্মানের সঙ্গে লাভ করেছিল···কত-না মেডেলই সে পেয়েছিল। আশ্চর্য্য এই যে, লেখাপড়ায় পরম মনোযোগী মুক্তপ্রায় এই লোকটির ভেতরে-ভেতরে যে অতখানি আগুন জমা ছিল, যা একনিমেষে সব-কিছু পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে পারে, তা কেউ জানতেও পারেনি।

সেদিনকার বরুণা আর আজকের বরুণায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সাতবছর আগের বরুণার এমন শুকনো চেহারা ছিলনা। স্বর্গা না হোক, তবু সে দেখতে সত্যিই সুন্দরী ছিল।

এই সেই বরুণা।

আজ তাকে দেখে না চিনতে পারাটা সোমেশের কাছে বিস্ময়কর নয়।

বরুণা নমস্কার ক'রে শান্তস্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে বললে, "ও, আপনিই সোমেশ, মানে—সোমেশবাবু?"

সোমেশ হাসলে—"না, কেবল সোমেশ। 'বাবু' শব্দটা আর তার সঙ্গে নাই-বা যোগ করলেন দিদি! আপনার ছোট ভাই সোমেশ, আপনি আমার দিদি···চমৎকার সম্বন্ধ।"

এইরকমেই হলো তাদের পরিচয়, এবং এই হলো তাদের সত্যিকার পরিচয়।

সোমেশ মহা খুশীতে বরুণার আতিথ্য স্বীকার করলে।

আশ্চর্য্য মেয়ে, বরুণা।

কোমলে-কঠিনে এম[illegible] যায়না, তাই সোমেশ বিস্মিত হয়ে যায়।

তার মন বলে [illegible]কেই আজ চাই। কেবল কোমল নয়, শান্ত [illegible] কাজ করার মত শক্তি সব মেয়েকেই [illegible] অর্জন করতে হবে। ললিতলবঙ্গলতা বা পেল[illegible] আজ নেই।

[illegible] যতই সে আলাপ করে, ততই মুগ্ধ হয়ে যায়, [illegible] হয়ে ওঠে।

সোমেশ, পরেশের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে। উত্তপ্তকণ্ঠে বলে, "আপনি যত যাই বলুন, আমার তো একটা স্বতন্ত্র মত আছে, তাতে আমি বলবো—এমন ক'রে চলতে পারেনা। এ-রকমভাবে চললে দুর্ভিক্ষে দেশ ছেয়ে যাবে, আমরা যে না খেয়ে শুকিয়ে মরবো।"

পরেশ গরম দুধের কাপে চুমুক দিতে-দিতে শান্তকণ্ঠে বললে, "কিন্তু, আসল কথাটাই যে বুঝলুম না সোমেশ, কিসে আসবে দুর্ভিক্ষ, আর কি চলতে পারেনা,—কিসে আসবে দুর্ভিক্ষ আর কিসে জাগাবে মড়ক, সেটা আমাকে বুঝিয়ে বলো।"

সোমেশ বললে, "এই যে কল-কারখানা সৃষ্টি, কৃষককে শ্রমিকে পরিণত করা, মাটির শ্যাম-সৌন্দর্য্য ঘুচিয়ে সেই জায়গা

রুক্ষ-কর্কশতায় পূর্ণ করা…এর ফলে আমরা পাবোনা আহার্য্য… সেইজন্যেই জাগবে দুর্ভিক্ষ, আসবে, মহামারী…”

“আহা, রোসো, রোসো, কথাটা আগে বুঝি।”

পরেশ একনিশ্বাসে দুধের কাপটা নিঃশেষ ক'রে একপাশে সরিয়ে রেখে দেয়, হাতের কাছে-রাখা গামছাটায় মুখখানা মুছে বলে “হ্যাঁ, এইবার ধীরে-সুস্থে কথা শুনে, উত্তর দিতে দাও। সোজা কথায় তুমি বলতে চাও—আমাদের মাঠের শ্যামল রূপ মুছে গিয়ে সেখানে কেন তৈরী হলো, ইট-কাঠ-লোহার কল-কারখানা। কিন্তু, তোমার মতে আমি মত মেলাতে পারছিনা সোমেশ, মনে করো একদিন আমরা এ-সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আমরা চেয়েছি, সহরে-সহরে, গ্রামে-গ্রামে কল-কারখানা সৃষ্টি করতে হবে, নানারকমভাবে শিল্পচর্চ্চা করতে হবে, মানুষ পেছিয়ে না থেকে, এগিয়ে যাক। কেবলমাত্র জমির উৎপন্ন ফসল নিয়েই তো তার দিন চলবে না! আজকের দিনে মানুষ বুঝেছে—”

বাধা দিয়ে সোমেশ বললে, “কিন্তু, কি লাভ হবে কৃষককে শ্রমিক ক'রে গ'ড়ে তোলায়? জানি, সেইজন্যেই আজ চলছে—সবুজ মাঠের সরসতা-উর্ব্বরতা ঘুচিয়ে সে-সব জায়গায় কল কারখানার প্রতিষ্ঠা, দিন-মজুরীর মধ্যে সরল চাষীকে এনে ফেলে তাকে বিপর্য্যস্ত ক'রে ফেলা!”

পরেশ আশ্চর্য্য হয়ে যায়—“তার মানে?”

সোমেশ উত্তর দিলে, “তার মানে সোজা—বাইরের

আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে পড়া—বাইরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মেলামেশা। কল-কারখানা কেবল এদেরই শ্রমে চলতে পারেনা, আসবে বাইরের বহু লোক, তারা কেউ চোর, কেউ ডাকাত, কেউ মাতাল, কেউ চরিত্রহীন। এই গ্রামের বুকে বসবে, বেসাতির কারবার, সব-কিছুই এখানে চলবে এবং এইসব সরল নিরক্ষর লোকেরা কাঁচা পয়সার লোভে কাজ করতে গিয়ে, নিজেদের যা-কিছু পবিত্রতা আছে সব হারাবে। আজ তাইতো দেখছি পরেশদা, গ্রামের আবখানার শ্যামলিমা ঘুচে গেছে, সেখানে জেগেছে রুক্ষ কর্কশতা, মাঠের বুকে কৃষককণ্ঠে আজ রামপ্রসাদী গান, নীলকণ্ঠের পদাবলী শুনতে পাইনা, শোনা যাচ্ছে, কলের ঘনঘন শব্দ···কর্মব্যস্ত লোকজন শুধু ছুটোছুটি করছে দেখতে পাচ্ছি।"

পরেশ হাসে।

সোমেশের পিঠ চাপড়িয়ে বলে, "হাঁ, আমি বুঝেছি তুমি যা বলতে চাচ্ছো। আগে একটা কথার উত্তর দাও দিনের পর দিন—বংশানুক্রমে কৃষক চাষবাস ক'রে এসেছে, তাতে সে কতখানি উন্নতিলাভ করতে পেরেছে? তাকে বিনিময় চালাতেই হয়। তারও সব-কিছুর দরকার। এখানকার কথা এখন থাক্, রাশিয়ার কথাটা ভাবো, তারা তাদের আহার্য্যের জন্যে কারো কাছে কোনোদিন হাত পাতেনি, বরং অন্য দেশের খিদেও তারা মেটাতে পারে তাদের উদ্বৃত্ত আহার্য্য দিয়ে। কিন্তু, তাই ব'লে তারা তাদের কল-কারখানা স্থাপন করতে, শিল্প

পালন করতে নিশ্চই নয়, সে-হিসেবে জগতে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ
দখল করেছে। কোনোদিকে তারা আজ পেছিয়ে নেই।
বিজ্ঞানে, কি শিক্ষায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, ব্যবসায় আজ জগতের
ন রাষ্ট্রকেই তাকে প্রথম শক্তি ব'লে স্বীকার করতে হয়েছে।
বাংলাদেশের কথা বলছি, আমরা আগেকার দিনের লোক নই,
তু নিয়ে খুশী হয়ে থাকতে আমরা পারিনা—চাইও না।
দের দৃষ্টি পড়েছে আমাদের দেশের দিকে, আমাদের
র দিকে, আমাদের রাষ্ট্রিক-স্বাধীনতার দিকে, সেইজন্তেই
আজ সকল দিকে উন্নতি। আমরা চাই, এগিয়ে যেতে।
দের বাংলার মাটি উর্বর, তাই শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ।
দের চাহিদা মিটিয়ে, আমরাও বাংলার বাইরে [illegible]র্য্য
ত পারি—পাঠিয়েও থাকি। কিন্তু, আমরা আজ শু[illegible]ই
চাষ নিয়েই খুশী থাকতে পারিনা। আমরা চাই উন্নতি,
এগিয়ে যাবো—মানুষ নামে নিজের পরিচয় দেবো। আমরা
চাই—শিল্পে বাণিজ্যে ব্যবসায় স্থান নিতে, সেইজন্তেই
সব-কিছু খাদ্যোৎপাদনের উপযুক্ত জমি রেখে, বাদ-জমিতে
কারখানার প্রতিষ্ঠা আর এগুলোকে কেবল চালু রাখা নয়—
ার উন্নতি করা। দেশের একদল লোক থাক শস্যোৎ-
র জন্যে—আর যারা আছে তারা আসুক এইসব কাজে।
রেখো, কেবল শস্যোৎপাদনে দেশের উন্নতি হবেনা,
শ্রমিক—মজুর-কুলিশ্রেণী। আমাদের লক্ষ্য থাকবে, মানুষ
দিকে, আমাদের শিক্ষার সার্থকতা হবে সেইখানে।"

সোমেশ দৃপ্ত হয়ে উঠলো, দৃপ্তকণ্ঠেই বললে, "কিন্তু, ওইখানেই যে আমার কথা। আমাদের দেশে কি না ছিল? কাপড়ের অভাব মেটাবার জন্যে ঘরে-ঘরে করতো তুলোর চাষ, চলতো, চরকা-তাঁত,—তখনকার দিনেও তো লোকে কাপড় পরতো পরেশদা—"

পরেশ বললে, "থামো। আমার কথাটা শোনো। বর্ত্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে ছাড়া কমছে না, সেইজন্যেই চরকা, তাঁত আজকের দিনের চাহিদা মেটাতে পারবে না বলেই মিলের দরকার। আজকের দিনে চরকায় কত সুতো তুমি কাটতে পারো—কত কাপড় তৈরী করতে পারো? আগেকার দিনে লোকে একখানা কাপড় প'রে আর গায়ে একটা চাদর দিয়ে যে-কোনো জায়গায় যেতে পারতো, আজ আমাদের শুধু কাপড়-চাদর নয়, আরও অনেক-কিছু চাই। ভদ্রয়ানা শেখবার সঙ্গে-সঙ্গে বাবুয়ানাও যে অনেকটা এসে পড়েছে এ-কথাটা তো তুমি অস্বীকার করতে পারবে না, সোমেশ!"

সোমেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কি বলতে গিয়ে সে থেমে যায়।

পরেশ বললে, "তুমি যা বলতে চাচ্ছো, মানে, এককালে ভারতের উৎপন্ন কাপড় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের চাহিদা মিটিয়েছে,—এই কথা বলবে তো?"

সোমেশ বললে, "হ্যাঁ। আপনি আজ সেকথা স্বীকার করবেন তো পরেশদা?"

পরেশ বললে, "কিন্তু, ওই যে আগেই বলেছি, বর্ত্তমানে পৃথিবীর লোকসংখ্যা অনেক বেশী, ভারতের চাহিদা ভারতই মেটাতে পারবে না, যদি শুধু চরকার ওপরে নির্ভর করে। আমাদের আজকের কথা এই—অতীত সেই যুগে মোহেঞ্জোদড়ে অনেক-কিছুই সঞ্চিত হয়েছিল, যা দেখে পাঁচহাজার বছর আগেকার সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের এতটুকু সন্দেহ থাকেনা। কিন্তু, তবু বলবো, কোন্ কালে পোলাও খেয়ে, আজও হাতে তার গন্ধ শুঁকলে তো চলবেনা, ওতে ঠকতে হবে যে নিজেকেই। এককালে এ-দেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব'লে প্রসিদ্ধ হয়েছিল, সেকথা মনে ক'রে আজ গর্ব্ব করবার দিন নয়, ওতে আসবে শুধু জড়তা, তাছাড়া আর কিছু নয়। আমরা আজ শুধু দেখছি—আমরা কোথায়? আজ যখন জগতে চলছে বুদ্ধির যুদ্ধ, শক্তির পরীক্ষা, অগ্রগতির জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা, আমরাই-বা কেন প'ড়ে থাকবো পেছনে? আমরা ওদের চেয়ে ছোট নই…শিক্ষায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে আমরা পেছিয়ে নেই…আমরা নতুন ধারায় চলবো, নতুন কর্ম্মপদ্ধতি ঠিক ক'রে নেবো, আমরা দেখবো বর্ত্তমানে অল্পসময়ের মধ্যে আমরা কি ক'রে আবশ্যকীয় জিনিস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করতে পারবো। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করা চলবে না, কারণ, আমাদের আয়ু সেকালের তুলনায় কত কমে এসেছে তা মনে করো।"

বলতে-বলতে সে হাসে—"আচ্ছা, মনে করো সোমেশ, রামায়ণে লেখে—রাবণরাজার শুধু অলৌকিক আকৃতিই

ছিলনা, আয়ু ছিল, দশটি হাজার বছর। আজ স্বল্পজীবী মানুষ আমরা, গাঁজাখুরি কথা ব'লে অবিশ্বাস ক'রে সে-সব কথা উড়িয়ে দিই। সে-কালের মুনি-ঋষিরা নাকি যোগবলে রাবণের চেয়েও দ্বিগুণ আয়ু লাভ করতেন—কেউ-কেউ আবার অমর হয়েও বর্ত্তমান ছিলেন।"

সোমেশ বিকৃতমুখে বললে, "আপনি এসব কথা বিশ্বাস করেন, পরেশদা?"

পরেশের মুখের ওপরে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে, বলে, "অবিশ্বাসই-বা করি কি ক'রে? কিছুকাল আগে পুষ্পক-রথের কথা লোকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আজ কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা এরোপ্লেন দেখে। আমরা আজ স্বীকার করতে বাধ্য হ'চ্ছি, সে-যুগে মানুষ, বিজ্ঞানে চরমোৎকর্ষতা দেখিয়েছিল, সেইদিক দিয়েই তারা এমন-কিছু পেয়েছিল, যাতে তাদের আয়ুও বেড়ে গিয়েছিল। আজকের দিনে আমরা বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে অনেক-কিছু আবিষ্কার ক'রে জগৎকে স্তম্ভিত ক'রে দিলেও, ভালো ক'রে দেখলে জানতে পারবো যে, এ-আবিষ্কার নতুন নয়, বহু শতাব্দী আগে এসব হয়ে গেছে। আমাদের অক্ষমতায় যা লুপ্ত হয়েছিল, আজকের এসব তার রকম-ফের মাত্র।"

সোমেশ তুড়ি দিতে-দিতে হাই তুলে হাত দু'খানা মাথার ওপরে প্রসারিত ক'রে দেয়···

"কিন্তু, আমাদের দেখছি, 'ধান ভানতে শিবের গীত'ই এসে

পড়লো পরেশদা। হচ্ছিলো কি কথা, আর, এসে পড়লো কি? কোথায় কল-কারখানা মজুর-কৃষক, আর কোথায় এলো, সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আর অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের কাহিনী।”

পরেশ হাসিমুখে বললে, “তাই হয় সোমেশ। হয়তো খুব বড় ক'রে খুব জটিল সমস্যার কোনো কথা সুরু হয়, তারপর শেষ হয়ে যায় এমনি অত্যন্ত সাধারণভাবে। কথাটা হ'চ্ছে কি—আজকের স্বল্পজীবী মানুষকে এই অল্পকালের মধ্যে শুধু কাজই ক'রে যেতে হবে।'

সে থামলো। মানে, থামতে বাধ্য হলো। বরুণা খল-নুড়িতে কবিরাজী-ওষুধ মেড়ে একেবারে মুখে দেবার মত ক'রে নিয়ে এসেছে।

শান্তকণ্ঠে সে বললে, “আলাপ-আলোচনা একটু থাক, আগে ওষুধটা খেয়ে নাও।”

পরেশ, সোমেশের পানে তাকালে।

“এই আমাদের ক্ষণস্থায়ী আয়ুকে কোনোরকমে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা। বর্ত্তমান আমাদের—”

বরুণা বললে, “আগে খেয়ে নিয়ে কথা বলো।”

পরেশ বিকৃতমুখে হাত বাড়ায়—“দাও।”

ওষুধ খেতে-খেতে সে বললে, “আর-একটু ক'রে মধু দিয়ো বরুণা, তবু কতকটা মুখরোচক হবে।”

বরুণা বললে, “কিন্তু, মধুর ভাণ্ডারই যে শূন্য। দোকানে মধু নেই। শুনলুম, যেসব বুনোরা আগে মধুর চাক ভেঙে

মধু সংগ্রহ করতো, তারা সব যুদ্ধের কাজে যোগ দিয়েছে, কাজেই মধু সংগ্রহ আর হয়না, আর, সেইজন্যেই এরপর মধুর অভাবে গুড় দিয়েই চালাতে হবে।"

পরেশ, সোমেশের পানে চাইলে—"শুনলেন?"

তার চেয়ে গম্ভীরমুখে সোমেশ বললে, "শুনলুম।"

পরেশ বললে, "এমনি ক'রে কত লোক জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিচ্ছে। কাঁচা পয়সার ওপরেই লোকের বেশী আকর্ষণ কিনা…"

সোমেশ বললে, "আমার ঘরে মধু আছে, ওবেলা পাঠিয়ে দেবো-এখন।"

বরুণা বললে, "আমি মনে করছি, মাত্রাটা কমানোই ভালো। কারণ, এরপর আর হয়তো মিলবেই না।"

পরেশ বললে, "কিন্তু, চিরকালই আমায় এমনি ক'রে ঘণ্টা ধ'রে ওষুধ খেতে হবে বরুণা? এমন একদিনও তো আসবে, যেদিন আমায় আর ওষুধ খেতে হবেনা…"

বলতে-বলতে সে হেসে ওঠে আর তার হাসির সঙ্গে-সঙ্গে বরুণার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে যায়।

চার

পরেশ, সোমেশের পানে চোখ ফেরায়।

"এবার আমাদের আগেকার কথায় ফিরে আসা যাক। হ্যাঁ, যত যাই বলো, কেবলমাত্র ক্ষেতে লাঙ্গল চ'ষে আজকের দিনে মানুষ কিছুতেই উন্নতি করতে পারবে না, এ আমি এককথায় ব'লে দিচ্ছি। তুমি কি বলতে পারো, প্রাচীনযুগের সঙ্গে এ-যুগের কিছুমাত্র মিল আছে? তুমি কি বলতে চাও, আজকের দিনেও আমরা শুধু চাষবাস নিয়ে সুখী হয়ে থাকতে পারবো?"

ক্ষুব্ধকণ্ঠে সোমেশ বললে, "না, সেকথা আমি বলতে চাইনা। আমিও চাই, যুগের তালে পা ফেলে অগ্রগতির পথে চলতে। কিন্তু, ওই একটা কথাই আমার মনে জাগে পরেশদা, কেমন ক'রে এত শীগগির সব বদলে গেল। শতাব্দীর কথা ছেড়ে দিয়ে আমি নিজে যা দেখেছি তাই বলি,—মাত্র সাত বছর আগের দেখা গ্রাম...মানুষ সেদিনও যা ছিল, আজও তাই আছে, অথচ মনের ধারা বদলে গেছে। দেশের ওপর দিয়ে যে হাওয়া বয়ে গেল তা..."

বাধা দিয়ে পরেশ বললে, "হাওয়া বইবেই। হাওয়ার গতি কেউ কোনোদিন রোধ করতে পারবে না। সেই সে-যুগের সংস্কার আজ ভাঙতে সুরু হয়েছে, মানুষের মন হ'তে ভয় দূর হয়েছে। তুমি লক্ষ্য ক'রে দেখ সোমেশ, ভাঙন কেবল

একদিকেই সুরু হয়নি, আমাদের বাইরে, আমাদের মনে—আমাদের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, সবদিক দিয়েই ভাঙন চলছে। মনের দিক দিয়ে স্থিতিস্থাপকতা আজ আমরা পছন্দ করিনা, কারণ, সেই স্থিতিস্থাপকতা আনে জড়তা—যা মানুষকে এগিয়ে যেতে দেয়না, বাঁধনের মধ্যে, গণ্ডির মধ্যে তাকে নিয়ে এসে ফেলবেই। সেখানে আছে ওই বিচার-বিতর্ক, পাপপুণ্যের মাপজোপ, সেখানে জাগে সৎ-অসতের হাজার প্রশ্ন, জাতির দ্বন্দ্ব, মারামারি, গোলমাল। আমাদের এ-দেশের লোকেরা এই স্থিতিস্থাপকতার পক্ষপাতি ছিল এবং যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা শুধু আহার্য্য উৎপাদন করেছে, চরকা চালিয়েছে—মানে, কোনোরকমে অশন-বসনের সংস্থানটা ক'রে নির্ব্বিরোধে সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে ধর্ম্মচর্চ্চা ক'রে দিন কাটিয়েছে। আজ আমরা বুঝেছি, এ-জড়তা, এ ক্লীবত্ব আমাদের দূর না করা ছাড়া উপায় নেই, তাই না চলছে চারিদিকে ভাঙার পালা···সংস্কার দূর করা···সমাজ-সংস্কার···চাষবাসের সংস্কার··· এমন কি, আমাদের মনের সংস্কার পর্য্যন্ত। পাপপুণ্য আমরা মানিনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম আমরা জানিনা, জাতবিচার আমরা করিনা, আমরা এতটুকুর মধ্যে, হাজার নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকতে পারিনা। বর্ত্তমান আমাদের কাছে মহামুহূর্ত্ত এনে দিয়েছে। এই ক্ষণিক মুহূর্ত্তকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে—আমাদেরই ত্যাগে, আমাদেরই কর্ম্মে, আমাদেরই প্রেরণায়।"

একসঙ্গে এতগুলি কথা ব'লে পরেশ হাঁপায়।

সোমেশ তার হাঁপানীর মুহূর্ত্তগুলি চুপ ক'রে থাকে, তারপর একটু হেসে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে, পরেশকেই নির্দ্দিষ্ট করে—"হ্যাঁ, আমাদেরই ত্যাগে পরেশদা—আমাদেরই কর্ম্মে। আপনার মত সব দিয়ে শুধু চামড়া আর হাড় ক'খানা রেখে আমরা মহিমামণ্ডিত করবো আমাদের সকল সাধনাকে। কি দরকার আমার পরেশদা? পরের জন্যে নিজেকে নিঃশেষে দান ক'রে আমার কি লাভ হবে বলো? তুমি বলবে—দান করাই মহত্তের পরিচয়। কিন্তু, কি দরকার আমার সে পরিচয় লাভ করবার?"

সে ফুলতে লাগলো, তার বড়-বড় চোখ দুটিতে আগুন জ্বলছিল।

পরেশ শ্রান্তকণ্ঠে বললে, "ভুল সোমেশ, মস্ত বড় ভুল। আমার নাম নাই-বা রইলো খাতার পাতায় লেখা, নাই-বা পড়লো ভবিষ্যতের মানুষ সে ইতিহাস। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি, আমার জাতকে ভালোবাসি, তাদের জন্যে আমার এ দানে আমি তৃপ্তিলাভ করবো। আমি জানবো, আমার কর্ম্ম আরও দশজনকে অনুপ্রেরিত করবে এই পথে আসতে, আমার ত্যাগ গ'ড়ে দিয়েছে সেই পথ। আজ তোমারও তো এতদিন সংসারী হয়ে বাস করবার কথা ভাই, তুমি কেন এলে এই বিপদসঙ্কুল পথে—যে পথে চলতে, সইতে হ'চ্ছে পদে-পদে লাঞ্ছনা, অত্যাচার, পীড়ন। তুমি জানো তোমায় এসব সইতেই হবে, তবু কিসের জন্যে তুমি এসেছো, সেকথা বলো। মহাভারতে

লিখেছে, দধিচীমুনি জগতের হিতের জন্যেই দেহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর অস্থিতে তৈরী হলো যে বজ্র, সেই বজ্রে মরলো, পাষণ্ড বৃত্রাসুর—যে ছিল, ত্রিভুবনের বিভীষিকা। দধিচীমুনি নিজের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খোদাই করবার জন্যে যে দেহ দান করেননি তা জানা যাচ্ছে…কেবল দুর্ব্বৃত্তের দমনের জন্যেই দিয়েছিলেন। আমার এ ত্যাগে যদি তোমার মতন আরও দশটি ছেলে জাগে, তাদের দ্বারা যে হাজারটি ছেলে জাগবে। আমার দান ও আমার ত্যাগকে তাই কেবল আমার স্বার্থের অনুকূল বলেই ধ'রোনা সোমেশ।"

উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকে।

সোমেশ একদৃষ্টে পরেশের পানে চেয়ে থাকে। অতি শীর্ণ চেহারা, চোখ দুটি উজ্জ্বল, কপোলাস্থি দু'দিকে উঁচু হয়ে উঠেছে। জামার গলার বোতামগুলো খোলা, তারই ফাঁক দিয়ে তার আধখানা বুকের হাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জামা খুললে দেখা যাবে কেবল একটা কঙ্কাল—শুধু ওপরে চামড়ার আচ্ছাদন আছে মাত্র। শিরাবহুল যে হাতখানা সামনের ডেস্কটার ওপরে প'ড়ে আছে, তার আঙুলগুলো পর্য্যন্ত সাদা হয়ে উঠেছে।

পরেশ তাকে কোনো কথা বলতে না দেখে তার পানে চাইলে, বললে, "হঠাৎ চুপ ক'রে গেলে যে সোমেশ—কথা বলছো না যে ?"

সোমেশ একটা হালকা নিশ্বাস ফেলে বললে, "কথা বলবো, কার সঙ্গে ?"

পরেশ আশ্চর্য্য হয়ে যায়—"কেন, আমার সঙ্গে ?"

করুণকণ্ঠে সোমেশ বললে, "কিন্তু আপনি তো মানুষ নন্ পরেশদা, আপনি যে মহামানবের পর্য্যায়ে চ'লে গেছেন। সংসারী মানুষ হিসেবে আপনার সঙ্গে অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা বলতে পারা যায়, মহামানব হিসেবে কেবল প্রণাম ক'রে স'রে পড়তে হয়।"

"কি রকম ?" পরেশ সচকিত হয়ে ওঠে।

সোমেশ বললে, "আপনি যেসব মহা-মহা বাণী বলছেন, তা শোনবার পর থেকে আপনাকে আর পরেশদা বলা চলেনা। দধিচীর আত্মত্যাগ, ক্রাইষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া, দাতাকর্ণের অসম্ভব দান...তবে সত্যসিদ্ধ যুধিষ্ঠিরই বা বাদ যাবেন কেন, সত্যসন্ধ রামচন্দ্রই বা এড়িয়ে গেলেন কেন ?"

পরেশ এবার হাসলে। বললে, "সত্যি এবার তুমি হাসালে সোমেশ। এত দামী কথাবার্ত্তাগুলো আমার মাঠে মারা যায় দেখছি। শোনো, যুধিষ্ঠির-রামচন্দ্রকে এযুগে আমরা বাতিল করেছি। ওদের নিয়ে কারবার যারা করবে তারা করুক গিয়ে। আমি আগেই বলেছি না—ধর্ম্মকর্ম্ম পাপপুণ্য আমরা মানিনা, সত্য-অসত্য আমাদের মাথায় তোলা থাক ? কবির ভাষায় বলবো, 'মানিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার।' আমাদের মনে যে কথাটা অহোরহ জাগছে, দেখছো, কবির মনে তার আগেই সে কথাটা জেগেছিল ? আর তিনি সেটা উত্তর-বংশীয়ের জন্যে অলক্ত-অক্ষরে লিখে রেখে গেছেন ? আমাদের এখন কেবল বলতে হবে ;

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ নাই বা আসে,
তবে তুই একলা চল্ রে।'

মহামানব, অতিমানব, ওসব বড়-বড় কথা থাক্, আমি একজন ক্ষুদ্র মানুষ, তবু আমার দানটা ক্ষুদ্র হবেনা কেবল মাত্র এই মনের জোর নিয়েই আমি এগিয়েছি।"

কখন নিঃশব্দ-চরণে বরুণা স'রে গিয়েছিল কেউ তা লক্ষ্য করেনি, এইসময় সে আবার ফিরে এলো···

"মহামানব, অতিমানবের কথা এখন থাক্, বেলা যথেষ্ট বেড়ে উঠেছে, স্নানটা সেরে যাহয় দু'টা খেয়ে নিলে ভালো হতো না?"

পরেশ যেন জেগে ওঠে—

"বটে, বটে, ওই পার্থিব কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম বরুণা। কথায়-কথায় দিন চ'লে গেলেও আমরা দু'জনের কেউ কিছু জানতে পারতুম না। অর্থাৎ কিনা—মানে···"

বরুণা মৃদু হেসে বললে, "একেবারেই অবাস্তব বস্তু কিনা, ভুলে যাওয়াটা কিছু বিচিত্র নয়। যা দেশের অবস্থা, আর তাই নিয়ে যা তোমরা ভাবনা সুরু করেছো···সোমেশ ভাই, আর নয়—তেল দিই, চট্ ক'রে ডুবটা দিয়ে এসো দেখি। এখানেই নাহয় দুটি খেয়ে নাও, তারপর দু'জনে গল্প ক'রে, বিকেলে বাড়ী যেয়ো।"

সোমেশ চিন্তিতমুখে বললে, "কথাটা খুবই ভালো দিদি, কিন্তু, বাড়ীতে আবার পিসীমা এসেছেন কিনা—সকালবেলায়

আজ যা রান্নার আয়োজন দেখে এসেছি, তাতে বাড়ীতে না খেয়ে এখানে খেলে রীতিমত 'কুরুক্ষেত্তর' না বাধিয়ে তিনি ছাড়বেন না।"

পরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার পিসীমা আছেন তা তো জানতুম না।"

সোমেশ উত্তর দিলে, "আছেন, কিন্তু তাঁর শ্বশুরবাড়ীর কড়া-আইনে, শ্বশুরবাড়ীর দরজার বাইরে আসার হুকুম তাঁর দীর্ঘ জীবনকালে হয়নি। আটবছরের মেয়ে রাজবাড়ীর বউ হয়ে একদিন ঢুকেছিলেন, তারপর আজ প্রায় পঞ্চাশবছর বয়েসে বিধবারূপে তিনি বাপের বাড়ী আসবার স্বাধীনতা পেয়েছেন। আসার উদ্দেশ্যটাও বলি, বাপের ভিটে দেখাও বটে, আর ভাইপোটিকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়াও বটে।"

বরুণা বললে, "যাবে ?"

সোমেশ একটু হেসে বললে, "হয়তো একদি যাবো। পিসীমার নিজের ছেলেমেয়ে নেই, তাঁর ভাসুরের ছেলেমেয়ে আছে, ছেলেটিকে পরেশদা শুধু নন, আপনিও চেনেন দিদি। আমাদের ডক্টর সুজিত রায়। মেয়েটিকেও দেখে থাকবেন— দীপান্বিতা। আমরা যাকে 'দীপা' ব'লে ডাকি।"

বরুণা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—"চিনি বইকি। দীপান্বিতা আর তার দাদা ডক্টর রায়কে খুব চিনি। ডক্টর রায়ই তো এঁর চিকিৎসা করেছিলেন প্রায় একবছর, কিন্তু আমাদের কপাল দোষ কিনা— তাই অতবড় একজন ডক্টরের চিকিৎসাও ব্যর্থ হয়ে গেল।

পরেশ বললে, "যাক, বেলা হয়ে গেছে। সোমেশকে আর বাধা দিয়োনা। এখন বাড়ী যাও সোমেশ, বিকেলের দিকে একবার এসো, এখানেই তোমার চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করছি। অবশ্য, আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, ওসব দিক একেবারে আলাদা।"

করুণভাবে সে হাসে।

পাঁচ

একদল লোক, হৈ-হৈ করতে-করতে উপস্থিত হয় পরেশের বাড়ীর সামনে।

পরেশের বাড়ী। লম্বা একখানা খড়ের ঘর···এর মধ্যে ছোট-ছোট দু'খানা কুঠরী ক'রে নেওয়া হয়েছে···দেয়াল বেড়ার ···ওপরে মাটির প্রলেপ দেওয়া। সামনের ঘরখানা বৈঠকখানার কাজে লাগে, পেছনের ঘরখানা, অন্দর। অন্দরের লাগাও বারান্দার এক-কোণে একটুখানি জায়গা ঘিরে সেইটুকুই হয়েছে রান্নাঘর।

একদিন বিরাট অট্টালিকায় পরেশ জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সোনার ঝিনুকে দুধ খেয়েছিল এটা গল্প কথা নয়। কেবল এই গ্রামই নয়, আশপাশের জয়নগর, চিতুড়ি, পাটুনী, আলমপুর প্রভৃতি সকল গ্রামের লোক জানতে পেরেছিল, তাদের জমিদার মোহন দাসের পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এই উপলক্ষে কত

দেব-দেবীর মন্দিরে পূজা পাঠানো হয়েছিল এবং বৃদ্ধ পিতা মাতা শিশুসন্তানটিকে নিয়ে কত দেব-মন্দিরে নিজেরা গিয়েছিলেন। তারপর আশপাশের সকল গ্রামের লোকই একদিন পরেশের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রিত হয়েছিল এবং শিশুকে 'মানুষ' হওয়ার আশীর্ব্বাদ ক'রে গিয়েছিল।

পিতা মাতার মৃত্যুর পর নাবালকের অভিভাবক হিসেবে সকল ভার নিয়েছিলেন ওই মাধব দাস।

দূর সম্পর্কে মোহন দাসের ভাই, কিন্তু মোহন দাস বর্ত্তমান থাকতে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিলনা বললেই হয়। মোহন দাসের মৃত্যুর আগে তিনি শিশুপুত্রের জন্যেই মাধব দাসকে ডাকিয়েছিলেন এবং তাঁরই হাতে সতেরো বছরের ছেলে পরেশের ভার দিয়ে মারা যান। লোকে বলে, পাতা-চাপা-কপাল আর পাথর-চাপা-কপাল। মাধব দাসের কপালটা পাতা-চাপা ছিল, তাই অকস্মাৎ তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। জেলে যাওয়ার আগেই পরেশ জেনে গেছে, তার জমিদারী শেষপর্য্যন্ত টিকবে না। কারণ, মামলা চালাতে জমিদারী বন্ধক দিতে হয়েছে—সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীখানাও।

আজ পরেশের কিছুই নেই।

এখানে এসে সে সস্ত্রীক সোমেশের বাড়ী উঠেছিল, তারপর কোনোরকমে এই ঘরখানি তৈরী করিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে এখানে এসে উঠেছে।

এখানে এসে পরেশকে এ-ঘরে বাস করতে দেখে সোমেশ মোটে খুশী হতে পারেনি, বার-বার অনুযোগ করেছে—"এ-ঘরে মানুষ বাস করতে পারেনা পরেশদা, আমার অতবড় বাড়ী প'ড়ে আছে, ওখানে চলুন। এখানে আমি কিছুতেই আপনাদের থাকতে দিতে পারবনা।"

পরেশ শুধু হেসেছে, বলেছে "দিতেই হবে ভাই, আমার অসুখটা তো জানো, লোকের কাছে থাকা আমার চলেনা।"

সোমেশ বলেছে, "আমার তো কেউ নেই পরেশদা, যার জন্যে আপনাকে ওসব কথা ভাবতে হবে…একখানা ঘরে আপনি নাহয় আলাদা হয়েই থাকবেন।"

পরেশ বলেছে, "থাকনা আর ক'টা দিন, তুমি তো এখুনি পালাচ্ছোনা। আর, আমি ? আমি যদিও পালাই, তোমার দিদি তো থাকবে, দেখো তখন।"

বলতে-বলতে সে বরুণার পানে তাকিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। বরুণার মুখ এক-নিমেষে বিবর্ণ হয়ে ওঠে ঠিক মড়ার মতই।

তার মুখের পানে সোমেশ তাকিয়ে থাকে…মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ রুক্ষ হয়ে ওঠে, বলে, "থাক্, থাক্, আপনাদের কাউকেই আমার বাড়ীতে যেতে হবেনা বাপু, আপনারা বিবাগী-মানুষ—এই ঘরে থেকে যে ক'টা দিন বাঁচেন, তপশ্চারণ করুন। কিন্তু, মনে রাখুন, হঠাৎ যদি আসে সাইক্লোন, হারিকেন, বা…"

বরুণা হঠাৎ হেসে ফেলে।

নিজের কথার অযৌক্তিকতা সোমেশ বোঝেনা, রাগে তার মুখখানা লাল হয়ে ওঠে, বলে, "হঠাৎ এ সবার মানে ?"

পরেশ মৃদু হেসে বলে, "তোমার কথা শুন। মানে, এ-দেশটা সমুদ্র-তীরে নয়, কাজেই এখানে হারিকেন, টাইফুন আসতে পারেনা—তবে, সাইক্লোন হ'তে পারে। কিন্তু সে-রকম তো অনেক-কিছুই হ'তে পারে। ধরো, ভূমিকম্প—যেটা হওয়া অবশ্য সম্ভব, কিন্তু তাতে নষ্ট হবে তোমার ওই দোতলা বাড়ী, এ ঘর নয়।"

সোমেশ নিজের কথার ভুল বোঝে, তবু জিদ ছাড়েনা, কথা না বললেও কয়েকবার গোঁ গোঁ করে।

পরেশ তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে শান্তকণ্ঠে বলে, "আর কেন ভাই, যা গেছে তা যেতেই দাও। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে এই ঘরই তুলেছি···এক-কথায় ফেলে যেতেও এতটুকু ব্যথা লাগবে না। আমার না ন কি ? লোকে যে বলে, সোনার ঝিনুক-বাটি মুখে নেওয়ার সৌভাগ্য নিয়ে আসা, আমি তো সে-সৌভাগ্যও লাভ ক'রেছিলুম, সোমেশ ! ভগবান আমায় কি দেননি বলো তো ? অমন বাপ, অমন মা, কুবেরের ঐশ্বর্য্য, নিজের পূর্ণ স্বাস্থ্য, ছিল সবই···আবার গেলও এক-কথায়। আমার খুড়তুতো ভাই নরেশ ছিল আমার চেয়ে দেড়-বছরের ছোট, জন্মের পরই তার মা মারা যান, বাপ তার তিনবছর পরে যান। আমার মায়ের বুকেই সে মানুষ, নিজের ভাই বলেই আমি তাকে জানতুম।"

একমুহূর্ত্ত সে নীরব রইলো, তারপর বললে, "তোমায় দেখলে আমার তার কথাই মনে হয় সোমেশ, কি ডানপিটে আর দুর্দ্দান্ত ছেলেই না ছিল সে। তার দেশ-সেবা নেবার পর হঠাৎ খবর পেলুম, একটা ডাকাতি-কেসে সে চ'লে গেছে আন্দামানে···তারপর তার মৃত্যুসংবাদ পেলুম আমি বেনারস-জেলে ব'সে। কাঁদতে গেলুম, একফোঁটা জলও চোখে এলোনা, শুধু মনে হলো—এই ভালো, এই ভালো। সে শুধু আমার ভাই ছিলনা, সে ছিল, বিপন্নের বন্ধু—সহায়। তার বিবেকে যা সত্যি ব'লে সে জেনেছে তাই গ্রহণ করেছে—কোনোদিন ভয় পায়নি, কোনোদিন পিছিয়ে আসেনি। আমি পরে শুনেছি, কি-রকম ভাবে মৃত্যু বরণ করেছে সে। বিদ্রোহী ছিল সে—জীবনভোর শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ক'রে গেছে।"

পরেশ নীরবে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে—চোখে তার জল ছিলনা, অগ্নির দাহিকা-শক্তি ছিল।

সোমেশ আর বসতে পারেনা। পরেশের এ-মুখ দেখতে সে অভ্যস্ত নয়। খানিকটা উসখুস্ ক'রে সে উঠে পড়ে।

পরেশ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ ক'রে নিয়েছে। আজও যদি সে একবার মত দেয়, তার স্বপক্ষে বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ সোমেশ সংগ্রহ ক'রে, মাধব দাসকে একবার দেখে নেয়। যাই হোক, পরেশের জমিতে কল-কারখানা এবং কলোনীর উচ্ছেদ সে করবে, ওই বাড়ীতে সে আবার পরেশ, বরুণাকে নিয়ে যাবে, সেখানে আবার গড়বে, ফল-ফুলের বাগান—ঠিক যেমনটি ছিল।

কিন্তু, পরেশ হাসে।

"কি হবে ভাই, কি হবে অনর্থক মামলা-মোকর্দ্দমা ক'রে? এ-দেশের লোকদের চিনতে আমার বাকি নেই। আজ যারা আমার স্বপক্ষে দাঁড়াবে ব'লে যাবে, কাল আদালতে দাঁড়িয়ে মাধব দাসের হয়ে আমার বিপক্ষে তারাই সাক্ষী দিয়ে আসবে। আর, সত্যিই খরচপত্র যথেষ্ট হয়েছিল। বন্ধকী-বাড়ী জমি-জমা মাধবকাকা যদি পরকে না দিয়ে নিজেই নিয়ে রাখেন, তাতে ভালো ছাড়া মন্দ হয়নি। মাধবকাকা এখানকারই লোক, সবাই তাঁকে চেনে, তিনিও গ্রামের প্রত্যেকের খবর রাখেন, কাজেই, যারা তাঁকে আজ মনিবরূপে পেয়েছে, তাদের কষ্ট পেতে হচ্ছেনা, নির্য্যাতনও সইতে হচ্ছেনা, এইটেই তাদের অনেক বড় লাভ। তাছাড়া, এই যে মিল-ফ্যাক্টরী তিনি করেছেন, এতে কেবল যে তাঁরই লাভ হ'চ্ছে তা নয়, দেশের অনেক বেকার লোক কাজ পেয়েছে—অনেক লোক এখানে খেতে-পরতে পাচ্ছে, এও বড় কম লাভ নয়। আমার আর কিছু দরকার নেই সোমেশ, আমার জীবন এখানেই কেটে যাবে, তারপর বরুণা..."

বলতে-বলতে সে বরুণার দিকে তাকায়—

"হ্যাঁ, বরুণার দিনও এমনিভাবেই কাটবে। বরুণা দেশসেবার ব্রত নিয়েছে—যত কষ্টই হোক, যত দুঃখই হোক, সব সইবে, সে সইবার ক্ষমতা ওর আছে। আমাদের পথ যে সুখের নয়, শান্তির নয়, বরুণা তা জেনে-শুনেই এসেছে।"

সোমেশ বুঝেও বুঝতে চায়না, বলে, "কিন্তু আপনার মাধবকাকার পরিচয় আপনি পাননি পরেশদা, উনি যে কি প্রকৃতির লোক তা গ্রামের যে-কোনো লোকের কাছেই জানতে পারবেন। কি উপায়ে তিনি আপনার সব নিয়েছেন তা কারও অজানা নেই, তাছাড়া, বহু উপায়ে তিনি অর্থ সঞ্চয় করেছেন, আজও করছেন, তা—"

বাধা দিয়ে পরেশ বললে, "করুন, তাতে আমার দুঃখ নেই, বরং আনন্দ আছে সোমেশ। আমি জীবনে দুঃখ পেয়েছি, তাই আমি সকলের ভালোর জন্যেই করি। আমি বলি, সবাই সুখী হোক, সকলের অভাব ঘুচে যাক। না, তুমিও দুঃখ পেয়োনা আমার জন্যে—আমার ভবিষ্যৎ তৈরী হয়ে আছে। শুধু মাঝে-মাঝে ভাবি এই বরুণার জন্যে···ওর জন্যে আমি কিছুই করতে পারলুম না···কিছু ওকে দিতে পারলুম না। সময়-সময় আমি বলি, সে চ'লে যেতে পারে যদি তার ইচ্ছে হয়, কিন্তু বরুণা শেষপর্য্যন্ত থাকতেই চাইছে। থাক, ওর শেষ সাধটা পূর্ণ হোক—ভগবান ওর আশা পূর্ণ করুন।"

ততক্ষণে বরুণা ঘরের বাইরে চ'লে গেছে।

চিরবাঞ্ছিতা

ছয়

কোলাহল করতে-করতে যে লোকগুলি এসে দাঁড়ালো, তাদের নেতা ছিল, নিতাই মণ্ডল। স্থানীয় কৃষক-শ্রেণীর লোক এরা, মাঠে চাষ-বাস ক'রে কোনোরকমে জীবিকানির্ব্বাহ করে।

নিতাই এদেশের লোক নয়, খুলনা জেলার কোন্ এক অখ্যাত গ্রামে এর বাড়ী ছিল. তখনকার দিনে জমিদারের পীড়নে বাধ্য হয়ে সেখানকার জমিজমা বিক্রয় ক'রে সপরিবারে এখানে চ'লে এসেছে। সংসারে আছে মা, স্ত্রী, একটি বিধবা বোন ও একটি ভাই। এখানে কয়েক-বিঘা জমি প্রথমে ভাগে চাষ করতে নিয়েছিল, বর্ত্তমানে পাকাপাকি চাষী-গৃহস্থ হয়ে বসেছে।

"ছোটকর্ত্তা, একবার বার হয়ে এসো গো—তোমার কাছে আমরা এসেছি।"

নিতাই হাঁক দেয়। লোকটি যেমন লম্বা-চওড়া—কণ্ঠস্বরটিও তেমনি উগ্র। হাঁক দিলে, বহুদূর হ'তে তার হাঁক শোনা যায়।

মোটা খাতাখানা সামনের উঁচু ডেস্কটার উপর খুলে, পরেশ কি-সব হিসাব মেলাচ্ছিল।

এদের চীৎকার তাকে সচেতন ক'রে তুললো···খাতাখানা মুড়ে রেখে পরেশ উঠলো।

কাল হ'তে হঠাৎ হাঁপের টানটা বেড়েছে, খুক্‌খুকে কাশিটাও যেন বেশী মনে হয়।

দিন আর বেশী দূরে নয়, পরেশ সেদিনকে চোখের

সামনে দেখতে পাচ্ছে তাই জাগতিক হিসাব-নিকাশ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

পরেশ আস্তে-আস্তে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

সকলেই একসঙ্গে নিজেদের কথা জানাতে চায় তাই গোলমালটা একটু বেশীরকমই হয়ে ওঠে।

পরেশ হাতখানা তোলে, হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে, "ভাই সব, আমার শরীর বড় খারাপ, তোমাদের মিনতি করছি, তোমরা একজন তোমাদের বক্তব্য জানাও।"

পরেশের পাংশু মুখখানার পানে তাকিয়ে বীরু সবাইকে ধমক দেয়, "আঃ, তোমরা সব করছো কি গো,—একটু থামো। দেখছো না, ছোটকর্তার শরীরের অবস্থা—দেহের কি হালহয়েছে? ও-মানুষকে নাস্তানাবুদ ক'রে আমাদের লাভ হবেনা কিছুই, তার চেয়ে নিতাই, তুমিই আমাদের কথাগুলো বাবুকে জানাও।"

নিতাই গর্জ্জন করে—"ছোটলোক সব, একেবারে ছোটলোক। দেখছো না বীরুমিঞা, ওদের ব'লে-ক'য়ে নিয়ে এলুম, আর ওরা কিনা সেই চেঁচামেচি সুরু করলে। বলি, ছোটলোক কি এমনি হয়? হয়, ব্যাভারে।"

সব চুপ ক'রে গেল। নিতাই এগিয়ে এলো।

একেবারে আভূমিপ্রণত হয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে সে বললে, "কিছু দোষ নেবেন না ছোটকর্ত্তা, ওদের স্বভাবই অমনি। সাধে কি আর ছোটলোক বলি? আপনি বসুন ছোটকর্ত্তা, দাঁড়াবেন না।"

নিজেই সে এগিয়ে গিয়ে দূর হ'তে মোড়াটা এনে সামনে পেতে দিলে। পরেশ বসলো।

নিতাই বললে, "হ্যাঁ, এইবার বলি ছোটকর্ত্তা, আপনি একটু মন দিয়ে শুনুন। আসল কথা, আমরা আর সইতে পারছিনে। আপনার জিনিস আপনি নিন—আমরা [illegible]। মাধববাবুর অত্যাচার আমাদের অসহ্য হয়ে উঠেছে, তিনি মানুষ নন্ ছোটকর্ত্তা, একেবারে জ্যান্ত কশাই।"

কালো নাপিত মাথা কাত করে—"কশাই ব'লে কশাই, ঢের-ঢের কশাই দেখেছি, এমন কশাই কেউ দেখিনি। চোখের এতটুকু পরদা নেই। সেদিন গিয়েছিনু, হপ্তার কাজ করতে, বাবু চটেই আগুন—বলেন, 'তুইও ওই চাষাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিস? দু'তিন সনের খাজনা বাকি পড়েছে, এবার বাঁশ-গাড়া করতে দেবো।' বললে না পেত্যয় করবে ছোটকর্ত্তা, আজ কেউ না জাগতে…রাত তখনও পোয়ায়নি…তখন কিনা আমার জমিতে বাঁশ পুঁতে সারা গাঁয়ে ঢেঁড়া দিয়ে গেল!"

রাগে, দুঃখে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে—চোখে জল এসে পড়ে।

হজরত দৃপ্তকণ্ঠে বললে, "বুঝুন ছোটকর্ত্তা। চিরটাকাল এই কালো, তার বাবা, তার ঠাকুরদা আপনাদের বংশে ক্ষেউরী ক'রে আসছে, ওই পাঁচবিঘে জমি আপনার বাবা, কালোকে দিয়েছিলেন। উঠবন্দী জমি হিসেবে মাধববাবু এককথায় কিনা

খাঁশগাড়ী ক'রে নিলেন? এখন ওর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ও যে পথে দাঁড়ালো—খাবে কি তাই বলুন।"

দলের সকলেই কালো-নাপিতের প্রতি অন্যায় ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে দেখা গেল।

পরেশ পাংশুমুখে অর্থহীন চোখে শুধু চেয়ে থাকে।

এদের সে চেনে—এই কালো-নাপিতকে সে বরাবর কালোকাকা ব'লে ডেকেছে। গ্রামাঞ্চলে পরস্পরের সঙ্গে মিলন থাকে, সম্পর্কও পরস্পরের সঙ্গে থাকে। একজনের কাজে অপরে প্রাণপণে সাহায্য করে। গ্রামে বড়-ছোটর পার্থক্য নেই, জাতির ব্যবধান থাকলেও সে ব্যবধান সকলেই মেনে চলে এবং সে ব্যবধান রেখেও তারা সম্প্রীতিতে বাস করে।

নিতাই বললে, "আমরা আপনারই প্রজা ছোটকর্তা, আজ স্পষ্ট ব'লে এসেছি, খাজনা আমরা ওঁকে দেবোনা। খাজনা দেব আপনাকে—সত্যি। যিনি আমাদের জমিদার। ঠকিয়ে জোচ্চুরী ক'রে যে সব গ্রাস করেছে সে আমাদের মালিক নয়। মাধববাবু আমাদের শাসিয়েছেন—জমি সব উঠবন্দীতে দেওয়া আছে, যে-কোনোদিন তিনি সব নিয়ে নেবেন।"

পরেশ শান্তকণ্ঠে বললে, "তোমরা ঠিক কাজ করোনি নিতাই, কাকাবাবুকে যত যাই বলোনা, তিনি যখন জমিদার তখন—"

নিতাই দৃপ্তভাবে বললে, "জমিদার তিনি নন, আপনি। উনি কে? চিরদিন পোদ্দারী করেছেন, টাকা সুদে-খাটিয়েছেন,

আমাদের জিনিস ফাঁকি দিয়ে নিয়েছেন—তবু আমরা ওঁকে মানবো? দেবতা ব'লে জানবো?"

পরেশ এবার হাসে…

"পোদ্দারীই করুন আর ব্যবসাই করুন, তাতে তোমাদের তো কিছু আসে যায়না নিতাই। আর, আমার সম্পত্তির কথা বলবে? দেনার দায়ে বিকিয়ে যাচ্ছিলো, তিনি নিজে দাম দিয়ে কিনে নিয়েছেন, এটা তো অন্যায় বা বে-আইনী নয়, বরং পরের হাতে পৈত্রিক-সম্পত্তি চ'লে যেতো, নাহয় তিনি নিয়েছেন। কে বলতে পারে, আর-কেউ এ-সম্পত্তি নিলে তোমাদের ওপর আরও কত অত্যাচার হতো…কত নির্য্যাতন চলতো।"

বাঁকুমিঞা বললে, "সে-হিসেবে ছোটকর্ত্তা, ইনিও বড় কম যান্না। বললে না পেত্তায় করবেন—ওই যে গাঁয়ের পাশে হাট বসে, তার তোলা-হিসেবে কত পয়সা আমাদের বুকে বাঁশ ড'লে নিচ্ছেন বলুন দেখি? বুড়োকর্ত্তা বেঁচে থাকতে, আমাদের নখপুলের হাটে যে তোলা ছিল তা দিতে আমাদের গায়ে বাজতো না। আর, এখন আমাদের নতুন হাট—যেটা মাধববাবু তৈরী করেছেন, তার মন-পিছু তোলা যোগাতে আমাদের প্রাণ যাচ্ছে। তারপর অন্যায় দেখুন, হাটে এক-মণের জন্যে যে তোলা দিতে হবে, দশসের কেন, পাঁচসের জিনিস নিয়ে গেলেও সেই তোলা দিতে হবে। বললে ওঁরা কথা কানে নেন্না। এ-অবস্থায় আমরা কি করবো সেইটাই ব'লে দিন আমাদের। আমরা কোন্‌দিকে যাবো বলুন।"

এবার নবীনদাস এগিয়ে আসে। তার চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে, বুকের ওপর হাত দু'খানা আড়াআড়িভাবে রেখে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়···দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "আমরা দখ্নের লোক ছোটকত্তা। খুলনে-জেলার শেষে আমাদের দেশ। এদেশে যখন আসি, তখন এই জমিদারই আমাদের পতিত-জমিতে বসতে বলেন। ওখানকার জমি ছিল তখন পাথরের মত শক্ত, লাঙ্গল চলতো না। ওই জমির জঙ্গল কেটে পাথরের মত জমিতে লাঙ্গল দিয়ে আজ পাঁচ-সাতবছরে আমরা সোনা ফলানোর উপযুক্ত করেছি ছোটকত্তা, এখন উনি হুমকি দিচ্ছেন—খাজনা বাড়াতে হবে, তাছাড়া সেলামী দিতে হবে, আর তা যদি না করি, আমাদের সব ফেলে চ'লে যেতে হবে। এটাই বা কি রকম হলো ছোটকত্তা? তোমরাই এনে আমাদের বসালে, আজ হুট্ ক'রে উঠতে বললেই আমরা উঠে যাবো? দেশে কি আইন নেই—এর কি বিচার হবেনা?"

পরেশ বললে, "তোমরা জমির খাজনা তো ফি-বছরই দিয়েছো···তার দাখিলা পাওনি?

"দাখিলা।"

কালো ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে—

"প্রথম-প্রথম দাখ্লে দিয়েছেন, কিন্তু এখন যে আর দাখ্লে দেন্না ছোটকত্তা! দাখ্লে চাইতে গেলে বলেন—কাল দেবো, পরশু দেবো।"

সরল কৃষকশ্রেণী। পরেশের মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে।

এদের বিভ্রান্ত করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। শিক্ষাহীন, সরলবুদ্ধি এইসব কৃষক-সম্প্রদায়, এদের মধ্যে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে,—বিশ্বাস করেই এরা প্রতারিত হয়েছে। মাধব দাস বরাবরই কূট চাল চালছেন,—কোনোদিন সহজ পথে তিনি চলেন নি।

বাংলার বেশীর ভাগ লোক কৃষক, চাষবাস ক'রে এরা জীবন যাপন করে। এরা ধর্মে প্রত্যয়শীল, এবং সেইজন্যেই কেবল মুখের কথায় বিশ্বাস ক'রে এরা আজ সর্ব্বস্বান্ত হ'তে বসেছে।

আর, মাধব দাস?

চিরদিন এমনিভাবেই তাঁর দিন কাটছে। গত দুর্ভিক্ষের সময় ব্ল্যাকমার্কেটিং ক'রে তিনি লক্ষ-লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেছেন। চোখের সামনে লোকে অনাহারে শুকিয়ে মরেছে, তিনি দৃকপাতও করেন নি। যুদ্ধের সময় তিনি গভর্ণমেণ্টকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন—তারপরই রায়বাহাদুর উপাধিটা লাভ করা তাঁর পক্ষে শক্ত হয়নি। আজ তাঁর এক ছেলে মহকুমার হাকিম, আর এক ছেলে পুলিসে সি-আই-ডিতে কাজ পেয়েছে।

আজকের নিবীর্য্য পরেশ কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, কোমর-ভাঙা সাপের মত শুধু গর্জ্জন করে, এ-ছাড়া তার করবার আর কিই-বা আছে!

নিতাই বিকৃতকণ্ঠে বললে, "এখন আমাদের উপায় কি? মাধববাবু সন্ধ্যের সময় আমাদের সকলকে কাছারীতে ডেকেছেন,

ওখানে তিনি কি বলবেন তা আমরা আন্দাজেই বুঝতে পারছি। তিনি আমাদের কাছ হ'তে টাকা চান। বলেছেন, সাতদিনের মধ্যে সব মিটিয়ে দিতে হবে, নাহ'লে তিনি বাঁশগাড়ী করবেন। কালোর কাল সাতদিন গেছে, তাই আজ ওর বাঁশগাড়ি হলো, আমাদেরও দিন আসছে।"

পরেশ অকস্মাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে—"রাখো তোমার বাঁশগাড়ী। আমি বলছি, তোমরা আজ টাকা দিতে যেয়োনা। কাকে দেবে টাকা? কেন দেবে টাকা? একশো-দুশো টাকা সেলামী দেওয়ার কথা তিনি বলেছেন শুনেছি। তোমরা ফসল বেচে যা-কিছু সংগ্রহ করেছো, তা লাগবে তোমাদের অসুখের চিকিৎসায়, তোমাদের পরনের কাপড় কিনতে আর তোমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে। তারপর আছে ক্ষেতে লাঙ্গল খরচ, বীজ বোনা। ও-টাকা জমিদারকে দিয়ে, তোমাদের ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে তাই আগে ভাবো। জমানো-টাকা তোমরা খরচ করতে পারোনা, পরিবারের ধনে তোমাদের অধিকার নেই। তোমরা শুধু নয়, আরও সকলকে এক ক'রে নিয়ে সবাই কাছারীতে যাবে, স্পষ্ট তোমাদের দাখিলা চাইবে, স্পষ্ট জানাবে তোমাদের অভাব-অনটন, জানাবে—তোমরা সেলামী দিতে বা জমির খাজনা বাড়ালে—দিতে অসমর্থ। একটা কথা জেনো, দুর্ব্বলের ওপরই চলে সবলের অত্যাচার। তোমরা যদি সংঘবদ্ধ হও, কারও ক্ষমতা হবেনা তোমাদের এতটুকু ক্ষতি করবার। তোমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলো, "অন্যায়ের উৎপীড়ন আমরা সইবো না, অন্যায়ের

বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াবো, যত অত্যাচার আর নির্য্যাতন হোক, আমরা সইবো।"

পনেরো-ষোলোটি কণ্ঠে যুগপৎ উচ্চারিত হলো—"অন্যায় আমরা সইবো না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াবো।"

সম্মিলিত-কণ্ঠের সে চীৎকার—জমিদার ও মিল-মালিক মাধব দাসের কানেও গিয়ে পৌঁছোলো।

সাত

সোমেশ স্বেচ্ছায় কাজের ভার গ্রহণ করে, বলে, "তুমি এসব কাজ পারবে না পরেশদা, যা করতে হবে আমায় বাতলে দিয়ো বাপু, আমার তো আর তোমার মত দেহ নয়, কাজেই দৌড় ঝাঁপের কাজ আমি সব করতে পারবো।"

দাখিলা আদায় করতে বড় কম বেগ পেতে হয়নি। অতি কষ্টে কালোর জমি আর-এক বছরের সর্ত্তে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মাধব দাসকে যত নিষ্ঠুর নিদারুণ ভাবা গিয়েছিল, লোকটা ঠিক তেমন নন, সোমেশ আজকাল এইকথাই বলে থাকে।

কৃষকেরা যা বুঝুক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরেশ সব বোঝে এবং বোঝে ব'লেই মুখ টিপে হাসে। মাধব দাসের চাতুর্য্য পরেশ

জানে। সামনাসামনি এ-পর্য্যন্ত তাঁকে বড় একটা কেউ কারও সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ করতে দেখেনি, অথচ, ভেতরে-ভেতরে তাঁর মত চাল দিতে তাঁর আর জোড়া নেই। তাঁর বুদ্ধির পরিচয় তাঁর কাজের মধ্যেই পাওয়া যায়, সামান্য খড়ের ঘরে জন্মে তিনি আজ কেবল এখানেই বিশাল হর্ম্ম্য তৈরী করেন নি, কলকাতাতেও অন্ততপক্ষে পাঁচ-সাতখানা বাড়ী তাঁর ভাড়ায় খাটছে, বালীগঞ্জে তাঁর বাড়ীখানা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সোমেশ বা পরেশকে তিনি উত্যক্ত করতে চান্নি, দু-একবার আপত্তি ক'রে সহজেই তিনি বাকি দাখিলা দিয়েছেন, বাদ আছে কেবল দু'তিনজনের, এদের সম্বন্ধে তিনি বিশেষ বিবেচনা ক'রে দেখবেন।

সেদিন দুপুর-রোদে ঘর্ম্মাক্ত হয়ে সোমেশ ফিরলো।

ফিরে, পরেশের বারান্দায় বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ব'সে সে কোঁচার কাপড় দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ফেললে। চৈত্রমাসের নিদারুণ রোদ চারদিকে যেন আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে, গরম বাতাস হু-হু ক'রে বয়ে যাচ্ছে।

হাতের কাছে পাখাখানা পড়েছিল, সেখানা নাড়তে-নাড়তে সে আবৃত্তি করে :

'প্রহর শেষে আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস,
তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্ব্বনাশ।'

চিরবাঞ্ছিতা

ঘুমের আবেশে পরেশের চোখ দুটি জড়িয়ে এসেছিল, সোমেশের কণ্ঠস্বরে তন্দ্রা টুটে গেল। আস্তে-আস্তে উঠে এসে যখন দরজায় দাঁড়ালো, তখন তার চোখে জড়িয়ে আছে,, তন্দ্রালুতা···সে যেন স্বপ্ন দেখছে।

সোমেশ আবৃত্তি বন্ধ ক'রে, পরেশের পানে সকৌতুকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "ঘুমুচ্ছিলে পরেশদা, অসময়ে এসে ঘুম ভাঙিয়ে ভয়ানক অন্যায় করেছি তো?"

"ঘুম?" পরেশ হাসে—"স্বপ্ন দেখছিলুম···অনেক বড় স্বপ্ন··· আশার স্বপ্ন···নিরাশার নয়। ঘরে এসো, কথা শুনি।"

সোমেশ আড়ভাবে শুয়ে পড়ে, বলে, "আর—ঘর। তোমরা হাজার হোক, মহামানব তো। ঘরের আর বাইরের পার্থক্য দূর ক'রে দিয়ে সবই একাকার ক'রে ফেলেছো,—যাবো কোথায়?"

পরস্পরের নৈকট্য তাদের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে। সোমেশ, পরেশকে আর আপনি ব'লে সম্বোধন করেনা।

পরেশ হেসে বললে, "মহামানবের অনুজ্ঞা, যাকে আমি ঘর ব'লে নির্দ্দেশ করছি, সেখানে এসো তুমি।"

"নেহাতই বলছো যখন—উঠতেই হলো।"

সোমেশ পায়ের জুতোটা খুলে ফেলে উঠলো।

পরেশ ঘরের মধ্যে নিজের জায়গাটিতে বসলো, সামনের মাদুরটা দেখিয়ে সোমেশকে বললে, "ব'সো,—তোমার সঙ্গে খুব জরুরী একটা কথা আছে।"

তারপর সন্দিগ্ধ-চোখে সোমেশের পানে তাকিয়ে বললে, "খাওয়া হয়েছে তো? না, পেটে হরিণছানা লাফাচ্ছে?"

সোমেশ হো-হো ক'রে হেসে ওঠে—"যা বলেছো দাদা। আজ তো তোমার এখানে খাওয়ার কথা। পিসীমার আজ একাদশী, কাজেই আজ আমি তোমার অতিথি। দিদিমণি এখানে খাওয়ার কথা বলায়, পিসীমা ভারি খুশী। একাদশীর দিন ব্রাহ্মণভোজন করানো তো ছোট্ট কথা নয়? অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করবে নাকি তোমরা। দিদি এই পুণ্যে সশরীরে স্বর্গে যাবেন, আর তোমায় টেনে সে-পর্য্যন্ত যেতেই হবে। অবিশ্যি, পিসীমা ভাগ্যে জিজ্ঞাসা করেননি—তোমরা কি জাত, তোমাদের হাতের ভাত-তরকারি আমার চলবে কিনা।"

পরেশ অকস্মাৎ গম্ভীর হ'য়ে ওঠে, বলে, "অন্যায় করেছো সোমেশ, ওঁকে সত্যি কথা বলা উচিত ছিল।"

সোমেশ বললে, "রক্ষে করো পরেশদা, পিসীমার কাছে ও-কথা বলার চেয়ে, না বলাই ভালো। আমরা আজ একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করছি, পিসীমাদের যুগে এটা একেবারে জাতি-পাতের ব্যাপার ছিল। আদ্যিকালের বদ্যি-বুড়ির মত তাঁর মন এখনও সেই সংস্কারের গণ্ডিতে আবদ্ধ আছে, দরকার কি গর্ত্তের সাপ খুঁচিয়ে? সুজিতও কোনোদিন জানতে দেয়নি, সে ঘরের আগল ভেঙে বার হয়ে পড়েছে, আমিও জানাইনি। উনি ওঁর শুচিতা বাঁচিয়ে সসম্ভ্রমে বেঁচে থাকুন, আমাদের কথা ওঁকে জানিয়ে উত্যক্ত করাবার কোনো হেতুই নেই।"

একটু থেমে সে বললে, "যাক্‌গে সেকথা। বাড়ী গিয়ে যথানিয়মে হাত-পা ধুয়ে পিঁড়ি নিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে হাঁক পাড়ছি—পিসীমা, ভাত দাও, ওদিকে পিসীমা তখন খাবি খাচ্ছেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, হ্যাঁরে? পরেশের বউ না তোকে নেমন্তন্ন করেছে? তবে আবার বাড়ীতে খেতে এলি কেন?…

তখন মনে পড়তেই ছুটে চ'লে এসেছি।"

পরেশ বললে, "বেশ করেছো। আমি বরুণাকে বলবার আগেই সে তোমার আসা জেনে, ভাত বাড়তে গেছে, চট ক'রে আগে খেয়ে এসো।"

বরুণা তৎক্ষণে বারান্দায় আসন পেতে, ভাত দিয়েছে।

সোমেশকে উঠতে হলো।

আসনে বসতে-বসতে হাসিমুখে বললে, "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কিনা…হাঁড়িতে একটা ভাত থাকলেও উপচে ওঠে।"

বরুণা করুণ-হাসি হাসে, "তরকারির ভাণ্ডার কিন্তু একেবারেই রিক্ত। শুধু কলমীশাকের তরকারি। আর-কিছু আজ কপালে জুটলোনা ভাই।"

"উঃ, চমৎকার! অতি চমৎকার! পিওর ভিটামিন, দিদি, যতটুকু খাবো ঠিক ততটুকু রক্ত হবে। সঙ্গে-সঙ্গে ব্রেণের অ্যাক্‌শান বাড়বে…হার্টের অ্যাক্‌শান বাড়বে…"

বলতে-বলতে সমস্ত ভাতের মধ্যে শাকের ঝোলটা ঢেলে সোমেশ পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগলো।

বরুণার হাসির মধ্যে বেদনা ঝরে···

"কি করবো ভাই, আজ বাজার হয়নি, শেষে ওই খানাটা হ'তে এই কলমীশাকগুলো তুলে তরকারি করতে হলো। জানি, খেতে পারবে না, কষ্ট হবে···"

"আঃ, থামুন—থামুন বলছি!"

সোমেশ চেঁচিয়ে ওঠে—"বড়ো বাজে বকছেন দিদি। আমাদের আবার খাওয়া, আমাদের আবার দুঃখকষ্ট। জেলে গিয়ে কত কি যে খেতে পেয়েছি তা জিজ্ঞাসা করেছেন একবার পরেশদাকে? কতদিন—কতদিন আমরা অনশনে কাটিয়েছি। জোর ক'রে খাওয়ানোর চেষ্টাতেই-না ওই মানুষটির ওই দুর্দ্দশা···একে-একে সব দাঁতগুলো আজ বিদায় নিচ্ছে! এতটুকু পরিশ্রম আর ও-শরীরে সইবে না। ঢের খেয়েছি দিদি, দারুণ পেট ভরেছে। দেখুন, একটি ভাতের দানা পর্য্যন্ত ফেলিনি।"

বাঁহাতে পেটে হাত বুলোতে-বুলোতে সে ঘন-ঘন উদ্গার তুলতে লাগলো···আহার-শেষে পরেশের কাছে এসে বসলো।

পরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "খাওয়া হলো?"

সোমেশ উত্তর দিলে—"প্রচুর খাওয়া হলো পরেশদা। খিদের মুখে দিদির হাতের শাকের ঝোল লাগলো যেন অমৃত। যে খেলে, তার লজ্জাসঙ্কোচ হলোনা—হলো, দিদিমণির। লজ্জায় আর উনি মুখ দেখাতে পারেন না। যাক, কি জরুরী দরকারে ডেকেছেন, বলুন তো? আমি তো কাল দুপুর হতে বাড়ী ছিলুম না, সাজাদপুরে গিয়েছিলুম ওখানকার একটা মিটিংয়ে। আজ

ফিরে এসে খেতে ব'সে শুনলুম, আমার এখানে নেমন্তন্ন···জরুরী দরকারও আছে।"

পরেশ খাতার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বললে, "বিশেষ জরুরী। কাকাবাবু কাল বিকেলে হঠাৎ এক পত্র পাঠিয়েছেন, পত্রখানা দিচ্ছি তোমায়—পড়লেই বুঝতে পারবে।"

খাতার মধ্যে কোথায় জানি পত্রখানা ছিল, সেখানা বার ক'রে সোমেশের হাতে দিয়ে পরেশ খাতা বন্ধ করলে।

মাধববাবুর পত্র।

তিনি মাসখানেকের জন্যে কলকাতায় গিয়েছিলেন, পরশু এখানে ফিরেছেন। পরেশ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হয়ে তাঁকে অপমান করবার জন্যে যে বিরাট বিপুল আয়োজন করেছে, এর কল্পনাও তিনি কোনোদিন করেন নি। আজ সাতবছর হলো তিনি—যখন এই জমিদারি, বাড়ী-ঘর নিলামে উঠেছিল তখন উপযুক্ত মূল্য দিয়ে নিজে কিনেছেন। কয়েকপুরুষ ব্যবধান হলেও, পরেশ সম্পর্কে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি যে পরহস্তগত হয়, তা তিনি সইতে পারেন নি। কাজেই নিজে যে নিয়েছেন এটা তাঁর অপরাধ নয়। পরেশ জানে, তার মামলা চালাতে সব-কিছু বাঁধা দিতে হয়েছিল, সে নিজেও অনেক-কিছু বাঁধা দিয়েছিল তাঁরই কাছে। তিনি অন্যায় ক'রে তার জিনিস দখল করেন নি, তবু এইসব প্রজারা নাকি সেই কথাই ব'লে থাকে এবং তারা পারতপক্ষে তাঁর আদেশ মানতে চায়না, উল্টে, বিদ্রোহ করবার ভয় দেখায়। এদের এই মনোভাবের জন্যেই খাজনা

পেয়েও তিনি দাখিলা দেননি, কিন্তু সোমেশের কথা শুনে, দিয়েছেন।

আর একটা কথা। সম্প্রতি তিনি জানতে পেরেছেন, পরেশ যে-জমিটার ওপর ঘর তুলেছে, সে-জমি আইনসঙ্গতভাবে নেয়নি। অবিলম্বে সেটার ব্যবস্থা করা দরকার এবং সেজন্যে পরেশ যদি পারে তো একবার তাঁর সঙ্গে যেন দেখা করে। লোকে যে পাঁচ কথা বলে, সেটা তাঁর অভিপ্রেত নয়, সেই-জন্যেই তিনি একবার দেখা করতে চান।

সোমেশ পত্রখানা মুড়ে, দলা-পাকিয়ে টান মেরে একপাশে ফেলে দেয়, দৃপ্তকণ্ঠে বলে, "দেখা করতে যাবে তো পরেশদা? চলো, তোমায় কাছারীতে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

সে দাঁতের ওপর দাঁত চাপে, চোখের দৃষ্টি একবার চারিদিকে বুলিয়ে নেয়—

"জানো পরেশদা, তোমার কাকাটি তোমায় একেবারে উচ্ছেদ করতে চান। এ-চেষ্টা তাঁর বহুকাল হতেই চলছে। একশো টাকা দিয়ে, তার পেছনে দুটো শূন্য কাগজে বসাতে আমিও জানি। ওয়ার্ডে কিছু লিখেছিলে? না, তা তুমি লেখোনি। সরল বিশ্বাসে টাকা নিয়েছিলে, দেশের কাজের জন্যে। যাদের বাঁচাতে তুমি টাকা নিয়েছিলে, ঘরবাড়ী জমিদারি বন্ধক দিয়ে—আজ কই, কেউ তো এলোনা তোমায় বাঁচাতে? আজ তোমার ঘরে খেলুম, শুধু কলমীশাকের ঝোল, তাও দিদি নিজে তুলে এনেছিলেন। কেন, সামান্য মাছ-তরকারি কিনতে পারলে

না তুমি? ঘরে পয়সা নেই এ-কথাটা চাপা দিতে এখন কত কথাই না বলবে—কিন্তু থাক্ পরেশদা, আমার কাছে জবাবদিহি তোমায় করতে হবেনা। আমি আর তোমার কে বলো?"

সরোষে সে উঠে দাঁড়ালো।

পরেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

সোমেশকে সে একটু ভয়ও করে। যা ছেলে, এখুনি হয়তো মাধব দাসের সামনে গিয়ে যা খুশি ব'লে আসবে, আতে আবার একটা নতুন কাণ্ডের সৃষ্টি হবে। অত্যন্ত গোঁয়ার, একেবারে একগুঁয়ে—জীবন-মরণের ভয়, সোমেশের নেই।

শান্তকণ্ঠে সে বললে, "ব'সো, ব'সো সোমেশ, এ-রকম অধৈর্য্য হ'লে কি চলে? মাথা ঠাণ্ডা ক'রে কাজ করতে হয়, নচেৎ ঠকতে হবে যে নিজেকেই।"

রুক্ষকণ্ঠে সোমেশ বললে, "ঠকতে আর কি বাকি আছে বলো দেখি পরেশদা? অতবড়ো বাড়ী হারালে, এতবড়ো জমিদারী হারালে, কোনোরকমে এই কুঁড়েঘরটি বেঁধে মাথা গুঁজেছো, বাজারের পয়সা জোটেনা, ওষুধের দাম জোটেনা—"

বলতে-বলতে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো, সে এবার ব'সে পড়লো। কতকক্ষণ একটি কথাও বলতে পারলে না।

পরেশ এবার হাসলে, বললে, "যেতে দাও, যেতে দাও সোমেশ, অত ছোট কথা নিয়ে থাকতে গেলে আমার চলেনা। আর ক'দিনই-বা থাকবো ভাই, দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে,

একদিন কবে শুনতে পাবে, আমি নেই। একটা দেশালাইয়ের কাঠির মতই জীবন, যতটুকু জ্বলবো ততটুকুই এর সার্থকতা… আলো দিয়ে ততটুকু সময় যেন উজ্জ্বল করতে পারি। তারপর অবশিষ্ট প'ড়ে থাকবে শুধু হাইটুকু। হ্যাঁ, পরে আমার নাম কেউ করুক আর না-করুক, এই জ্বলার সময়টুকুর মধ্যে আমি ততটুকু কাজ যদি ক'রে যেতে পারি—"

সে অন্যমনস্কভাবে একদিকে তাকায়।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে সোমেশ ধড়ফড় ক'রে উঠে পড়লো।

পরেশ তার পানে তাকালে—"কিন্তু, আমার সব কথা যে এখনও বলা হয়নি সোম, ব'সো।"

সোমেশ দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললে, "সন্ধ্যেবেলায় আসবো পরেশদা, এখন কথা বলতে গিয়ে, কি বলতে কি ব'লে ফেলবো ঠিক নেই। আমি খানিকটা ঘুরে আসি, সন্ধ্যের দিকে মাথাটাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

তারপর মুখ ফিরিয়ে হেসে বললে, "ভয় নেই, ওই পাপিষ্ঠ লোকটার কাছে আমি যাচ্ছিনা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো সে-সম্বন্ধে।"

হুম্‌হুম্‌ ক'রে পা ফেলে সে চ'লে গেল।

আট

বাড়ীতে এসেই সে যে নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছিল, পিসীমা তা কিছুই জানতে পারেন নি।

ভাইপোটির জন্যে তিনি বড়ো কম উদ্বিগ্ন ছিলেন না।

জীবনে কোনোদিনই তিনি সুখী হ'তে পারেন নি। গরীবের মেয়ে, রাজবাড়ীর বধূরূপে আটবছর বয়েসে ঢুকেছিলেন, তারপর দীর্ঘ পঞ্চাশবছর বয়েসে তিনি পেয়েছেন মুক্তি। আজ তাঁকে বারণ করতে কেউ নেই, বাধা দিতেও কেউ নেই।

রাজবাড়ীর বধূ—রাণীমা-আখ্যাও অদৃষ্টে জুটেছিল। অসীম সম্পত্তি বিলাসিতার মধ্যে গিয়ে পড়লেও, গ্রামের মেয়ে মনে-প্রাণে গ্রামের মেয়েই থেকে গিয়েছিল।

আজও তাঁর সেই প্রথম বধূ-জীবনের দুঃখময় কাহিনী মনে পড়ে। বাড়ীর নিয়মানুসারে একলা সুসজ্জিত ঘরে থাকে বালিকা-বধূ, মেঝেয় শুয়ে থাকে—দাসী। রাজপুত্র স্বামী মাসের মধ্যে এক-রাত্রিও শয়নগৃহে আসেন কি না সন্দেহ।

এই দীর্ঘ পঞ্চাশবছর বয়েস পর্যন্ত কেটেছে এমনিই। অথচ, কিই-বা না ছিল? সে-কালের জুড়িগাড়ী, এ-কালের মোটরগাড়ী, দাসদাসী, আত্মীয়পরিজন—ছিল সবই। এদেরই মাঝে রাণীমা ছিলেন, অনুপমা। হীরা-মানিকে সমস্ত দেহ পূর্ণ, দামি-দামি শাড়ি-ব্লাউজ...তাঁর কথায় চলে সমস্ত সংসার। বাইরে দেখে লোকে তাঁকে ঈর্ষা করতো, জানতো না, ভেতরে তিনি কতবড়ো দুঃখিনী।

চিরবাঞ্ছিতা

এইভাবেই দীর্ঘ দিন কেটে গেছে।

তাঁর দেবর ছিলেন বরাবর রাজবাড়ীর গোত্র ছাড়া, রাজ-
বাড়ীর আইন-কানুন কিছুই তিনি মানতে পারেন নি, সেজ
রাজবাড়ীতে তাঁর স্থানও হয়নি। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে চ'লে য
বিহারে এবং তারপর অত্যন্ত সাধারণভাবেই জীবন কাটিয়েছে
তাঁর মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র সুজিত ও কন্যা দীপান্বিতা কলকাত
এসেছে। সুজিত বিলেতে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, বোন
জ্যেঠাইমার কাছে রেখে সে ডাক্তারী পড়তে গিয়েছিল, সম্প্র
ফিরে এসেছে।

দীর্ঘকালের বন্দিনী অনুপমা, মুক্তি পেয়েছেন এই সেদি
মাত্র তিনমাস।

আটবছরের যে মেয়েটি গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ী—বাপের বাড়
কারও সঙ্গে তার কথা বলার অধিকার ছিলনা। বাপ বা ভ
সসঙ্কোচে যখন গিয়েছেন—নীচে দাঁড়িয়ে ওপরে জানলা-পা
তাঁকে দেখে এসেছেন—এইটুকুই; কথা বলা, বা, সামনে আস
অধিকার তাঁদের দেওয়া হয়নি।

তবু তাঁরা ছিলেন সুখী—যেহেতু তাঁদের মেয়ে, রাজার রাণ
তাঁরা জানতেন না, বাইরের পরিচয়টাই সব নয়, তাঁদের মে
কাঙালিনীর চেয়েও দুঃখিনী।

স্বামী মারা যান, বাড়ীতে নয়—তাঁর রক্ষিতা-মেয়েটি
কাছে। বিষয়সম্পত্তি অনেক তিনি উড়িয়ে গেছেন, অনেক
কিছু সেই মেয়েটিকে দিয়েছেন, কেবল শ্যামবাজারের একখা

বাড়ী অনেক দয়া ক'রে তিনি স্ত্রীর নামে রেখে গেছেন, আর আছে, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা।

ছোটভাই ছিলেন, ত্যাজ্যপুত্র···সমাজতন্ত্রী সাধারণ মন নিয়ে সুজিতের পিতা এই রাজার ঘরে বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে বাস করতে পারেন নি। সেই অপরাধে পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। পুত্র-কন্যার জন্যে তিনি কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, কেবল তাদের উচ্চশিক্ষা [illegible] ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন মাত্র।

সেই রাজা-স্বামী যেদিন মারা গেলেন, সে-[illegible]টা শুনে অনুপমা প্রথমটা অকস্মাৎ অতিমাত্রায় স্তম্ভিত হয়ে গি[illegible]ছিলেন। কাঁদবার চেষ্টা করেও তিনি কাঁদতে পারেন নি। যঁ[illegible] সান্ত্বনা দেবার আশায় তাঁর আশে-পাশে এসে জমেছি[illegible] তাঁরা তাঁর চেয়ে বেশী বিস্মিত, বেশী স্তম্ভিত হয়ে [illegible]ছিলেন। তিনি কিন্তু নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে [illegible]ছিলেন।

এ তাঁর মুক্তি। কেবল মুক্তি বলা চলেনা—মহা মুক্তি বলতে হবে। আট-ন'বছর বয়েসে যে বন্ধন অসহ্য হয়ে উঠেছিল, সেই বন্ধনই যে-সময়ে পরম কাম্য হয়ে উঠেছিল, সেইসময়ে পেয়েছিলেন তিনি কঠিন আঘাত। যাকে উপলক্ষ ক'রে একদিন সমস্ত জগৎটাই অনবদ্য সুন্দর হয়ে উঠতো, তাঁর জীবনে তাকেই পাওয়া হয়নি। ফোটবার আশায় কুঁড়ির বুকে যা-কিছু সঞ্চিত ছিল, তা কবে যে শুকিয়ে গেল, বাইরের জগতে কেউ সে-খবর পায়নি।

চিরবাঞ্ছিতা

মুক্তি…মুক্তি…পরম মুক্তি।

তাই কান্না আসেনি। মনে হলো, একটা ভারি বোঝা বুক হতে নেমে গেল।

লোকে কিন্তু শিউরে উঠেছিল। তাঁর সম্বন্ধে গোপনে রাজবাড়ীর মধ্যেই অনেক আলোচনা হয়েছিল, অনুপমা সে-সব কথায় কানও দেননি।

রাজবাড়ীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে, একদিন দীপা ও সুজিতের হাত ধ'রে তিনি এসে উঠলেন, শ্যামবাজারের বাড়ীতে—অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে।

তিনি বাঁচলেন।

নিজের হাতে কাজকর্ম…জড়তা বা অবসাদ জাগবার সময়টুকু পর্যান্ত নেই…তোষামোদ করতে কেউ হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে আসেনা কোনো-একটা কাজ করতে গেলে।

অনুপমা মাথা নোয়ান্, অদৃশ্য-দেবতার কাছে—

বেশ করেছো ঠাকুর, এই ভালো, আমার এই ভালো। শেষ-জীবনেও যে তুমি আমার বাধা-বাধকতার বাঁধন কাটিয়েছো, এর জন্যে তোমায় নমস্কার জানাই।

রাজবাড়ীর জ্যোতিষী গুণে বলেছিলেন, এয়োরাণী ভাগ্যবতী সিঁথের সিঁদূর নিয়ে, স্বামীর কোলে মাথা রেখে, ড্যাং-ড্যাং ক'রে চ'লে যাবেন কারও পরোয়া না ক'রে। কিন্তু, হলোনা কিছুই। সেই থানও পরতে হলো, সিঁদুরও মুছতে হলো।

অনুপমা এসেছেন, বাপের বাড়ী।

আটবছর বয়েসে এতটুকু মেয়েটি এ-বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিলেন, বিয়াল্লিশবছর—প্রায় সাড়ে-তিনযুগ পরে পঞ্চাশবছর বয়েসে তিনি ফিরে এসেছেন আবার সেই বাড়ীতে।

মুক্তির আনন্দে এখানে এসেই তিনি শিশুর মত ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছেন, ভুলে গেছেন অর্দ্ধশতাব্দী তাঁর মাথার ওপর দিয়ে কেটে গেছে।

পিসীমার ছেলেমানুষী দেখে সোমেশ হাসে।

তার হাসি দেখে পিসীমাও হাসেন—

'আর বলিসনি বাবা, রাজবাড়ীর বউ হয়ে সেখানে গিয়ে, হাতে-পায়ে খিল ধ'রে গেছে। মনে হয়েছে, আমি একজন স্থবীর মানুষ—আমার এতটুকু শক্তি নেই। ঠুঁটো-জগন্নাথের মতন, হাত-পা থাকতেও ব'সে শুধু চোখে দেখে যাই, শুধু কানে শুনে যাই···সামনে হাজার অন্যায় দেখেও তার উপায় করতে পারিনি···একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারিনি, কেন করা হচ্ছে। ধর্ম্মের কথা বলতে পারিনি, ওরা হেসে বিদ্রূপ করবে। আজ মনে হচ্ছে, আমার সেই ছোটবেলার জীবন ফিরে এসেছে, আমি ছোট্ট মেয়ে হয়েছি।'

একদিনের জন্যে এখানে এসেও তিনি দশ-পনেরো দিন থেকে গেছেন।

দীপান্বিতার পত্র এসেছে, তুমি কবে আসছো, বড়োমা দাদা ভারি অবাধ্যপনা করছে। সময়ে খায়না, স্নান করেনা,

শুধু বাইরে-বাইরে ঘোরে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, দিনরাত এত 'কল' আসে—জানিস তো, এই হচ্ছে, পয়সা রোজগারের সময়। কিন্তু বড়োমা, দাদা কোনোদিন ষ্টেথিসকোপ নিয়ে বাইরে যায়না, কতদিন পেনটাও প'ড়ে থাকে। ডাক্তারমানুষ, না রইলো বুক দেখবার যন্ত্র, না রইলো প্রেস্ক্রপশান লেখবার পেন। আর, জানো বড়োমা, দাদা সেদিন রাত্রে বাড়ীতেও আসেনি। ভয়ে মরে যাই একা বাড়ীতে থাকতে। তুমি বাপু তাড়াতাড়ি এসো। দাদা আবার কবে পিঠটান দেবে কে জানে।…

এই পত্র পাওয়ার পর আর থাকা চলেনা।

এই পত্রের সম্বন্ধেই বলতে হবে সোমেশকে—সে তাঁকে নিয়ে যাবে কলকাতায়।

সোমেশকে তিনি এখানে থাকতে দিতে চান্‌না। জমি নেই, জমা নেই, আছে শুধু ভাঙা বাড়ীখানা। এখানে কেই-বা ওকে দেখবে অসুখ-বিসুখ হলে, আর, রান্না-বান্না করেই-বা খেতে দেবে কে ?

কোনোরকমে সোমেশের বিবাহটা দিয়ে তাকে তিনি সংসারী করতে চান। হারাধনকে দিয়ে তিনি অনেক খোঁজ-খবরও করাচ্ছেন, নিজেও দু'চারজনকে বলেছেন, যদি কোনো পাত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়। মনে-মনে তিনি অনেক মতলবও করেছেন। কিছু টাকা দিয়ে এই ঘরবাড়ীগুলো মেরামত করবেন, সোমেশকে কিছু টাকা দেবেন, যাতে সে ব্যবসাই

হোক আর জমি-জমাই হোক—যাহোক কিছু ক'রে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে।

পরম স্নেহে পিসীমার দুটি চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

তাঁরই পিতৃপুরুষের বংশধর—বংশটা তো রাখা চাই! আজও তিনি আছেন, এইসময় তাকে ঘরসংসার পাতিয়ে দিয়ে সংসারী করতে চান। বিবাহ না দিলে ও তো চিরকালই এমনি বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়াবে। এখন ওর ঘরই-বা কি, আর বারই-বা কি—সবই সমান। পিতৃবংশধরকে এমনভাবে পথে-পথে বেড়াতে দিতে তিনি চান্‌না। বিবাহ ক'রে সংসারী হয়ে বসুক, গাঁয়ে তবু একটা ঘর বাড়বে।

এই তো ছোট্ট গ্রাম। এরই ও-ধারে বসেছে কল, কারখানা। সমস্ত দিন এই এতদূরেও কলের শব্দ আসে, ঘস্‌ঘস্‌ঘস্—যেন পাগল ক'রে দেয়।

হারাধনের জামাই ওই কলে কাজ করে, হপ্তা-হিসেবে পায় মন্দ নয়। কাটোয়ায় তাদের বাড়ী। হারাধনের মেয়ে নাতি-নাতনী সেখানে থাকে।

জামাই আগে শ্বশুরের কাছেই থাকতো, কারখানা-অঞ্চলের বস্তীতে থাকতো না। আজ মাস-তিন-চার আর সে শ্বশুরের ছায়াও মাড়ায় না। দূর হ'তে শ্বশুরের ছায়া দেখলে সে চট্‌পট্ সরে পড়ে।

হারাধন দুঃখ করে—জামাইটা ছিল ভালো দিদিমণি, মরতে ওকে এখানে কাজে লাগালুম। কি কুক্ষণে যে কলে ঢুকলো!

এখন ওইমানুষ কিনা, হেন নেশা নেই যা না করে, হেন কুকর্ম্ম নেই যা করতে পেছিয়ে যায়। এর চেয়ে নিজের দেশে যে ভালো ছিল গো! চাষ-বাস করলো, তা হোকনা পরের জমিতে, তবু আর্দ্ধেক বখরা তো পেতো! কি কুক্ষণে কাঁচা-পয়সার লোভ দেখালুম, আর দেশে-ঘরেও যায়না! মেয়েটা আমার কত দুখ্যু ক'রে যে চিঠিপত্তর লেখে গো, পড়তে চোখের জল সামলানো যায়না।'

সোমেশ জানে, ষ্টেশানটার কথা। প্রথম ট্রেন হ'তে নেমে ষ্টেশানের পানে তাকিয়ে সে ঠিকই জেনেছিল, এখানকার গ্রাম্য জীবনেও কতবড়ো পরিবর্ত্তন এসেছে। সেই জানার ফলেই সে বিস্মিত হয়না, কিন্তু অনুপমার দুটি চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

সেদিন ঘাটের পথে একটি মেয়েকে হঠাৎ তাঁর পছন্দ হয়ে গেছে—সে চাটুয্যেদের মেয়ে, বিমলা।

দেখতে ফর্সাও আছে, চোখ-মুখও ভালো, আর, অত্যন্ত ঠাণ্ডা-প্রকৃতির। মুখে তার কথা নেই, হাঁটাটি পর্য্যন্ত অতি সুলক্ষণার মতন।

কথাটা একবার সোমেশকে যখন বলছিলেন, সে কোনো উত্তরই দেয়নি, তার মাথায় তখন বাংলার কৃষকদের কথা জাগছিল।

অনুপমা কথাবার্ত্তা প্রায় ঠিকঠাক ক'রে ফেলেছেন—পাত্রীর পিতা আজ সোমেশকে দেখতে আসবেন বৈকালে।

সোমেশ কখন এসে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়েছে তা তিনি কিছুই জানতে পারেন নি।

নয়

ধড়ফড় ক'রে উঠে গায়ে জামাটা দিয়ে সোমেশ বার হওয়ার উদ্যোগ করতেই পিসীমার চোখে প'ড়ে গেল—

"ওমা, তুই বাড়ীতেই ছিলি, সোমা। আমি এদিকে তোর জন্যে হাঁ ক'রে ব'সে আছি। জামা গায়ে দিয়ে আবার বার হচ্ছিস বুঝি? না, না, আজ আর বার হওয়া নয় বাপু, লোকের কাছে এরপর মুখ দেখাতে পারবো না—কথা দিয়েছি, বিকেলেই দেখা-শোনা হবে।"

সোমেশ যেন আকাশ হ'তে পড়ে—"কথা দিয়েছো মানে? কাকে কথা দিয়েছো, আর, কি কথা দিয়েছো পিসীমা?"

অনুপমা বললেন, "তোকে আজ দেখতে আসবে যে। বেশ মেয়ে—খাসা মেয়ে। দেখে আমার বেশ পছন্দও হয়ে গেছে। গরীবের মেয়ে, বাপ ওই চাঁদপাড়ার ইষ্টিশানমাষ্টার। মেয়ের মামার বাড়ী এখানে কিনা, তাই দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে। হ্যাঁ, লক্ষ্মী-শ্রী আছে। এত নরম আর এত শান্ত—কি বলবো তোকে—দেখেই আমার পছন্দ হয়ে গেছে। এই বিকেলে মেয়ের বাবা আর দাদামশাই তোকে দেখে যাবে, তারপর কথাবার্তাও পাকাপাকি ক'রে ফেলবো। এই সামনেই আর পাঁচদিন-বাদে যে দিনটা আছে, ওইদিনে তোর বিয়েটা দিয়ে আমি নিশ্চিন্দি হয়ে চ'লে যাই।"

সোমেশ যেন আকাশ হতে পড়ে—

চিরবাঞ্ছিতা

"এর মধ্যে সব ঠিক ক'রে ফেলেছো, পিসীমা? একেবারে সব ঠিক? দেখতে আসা, আশীর্ব্বাদ, গায়ে-হলুদ, আবার বিয়ে —কিছুরই যে বাকি রইলো না দেখছি।"

সোমেশের মুখের পানে তাকিয়ে অনুপমা যেন থতমত খেয়ে যান, টেনে-টেনে বলেন, "কেন বল্ দেখি! বিয়ে করবিনি? ওদের সঙ্গে দেখাও করবিনি?"

সোমেশ বললে, "দেখা অবিশ্যি করতেই হবে, বিশেষ তুমি যখন কথা দিয়েছো। তোমার মর্য্যাদা আমায় রাখতেই হবে পিসীমা, কথাটা তো নেহাৎ সোজা নয়?"

তারপরই সে হাসে—"হাজার হোক একটা রাজবাড়ীর বউ ছিলে তুমি, চিরটাকাল হুকুম করেই এসেছো আর সঙ্গে-সঙ্গে হুকুম তামিলও হয়েছে। আজ তোমার হুকুম তামিল না ক'রে কি আর উপায় আছে পিসীমা?"

পিসীমার মনে যেটুকু অন্ধকার জমছিল, তার কথা বলার ধরনে সেটুকু দূর হয়ে গেল, হাসিমুখে তিনি সোমেশের দিকে তাকালেন।

সোমেশ বললে, "তারপর, সেই ভদ্রলোকদের সঙ্গে কবে কথাবার্ত্তা হলো, শুনি।"

অনুপমা আর-একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, "শোনো কথা। কথাবার্ত্তা আর হলো কই? ওঁরা এলে পরে হবে। আমি কেবল মেয়ে দেখেছি, পছন্দ করেছি, ওঁদের ডেকে পাঠিয়েছি, এই। ওঁরা আসুন, তারপর কথাবার্ত্তা হবে।"

সোমেশ হাসি চেপে গম্ভীরমুখে বললে, "অর্থাৎ, সোজা কথায়, ছেলে পছন্দ হওয়ার পর কথাবার্ত্তা হবে, কেমন ?"

অপার বিস্ময়ে অনুপমা গালে হাত দিলেন—"ওমা, তুই বলিস কি সোমা ? ছেলে আবার পছন্দ-অপছন্দ কি ? ছেলে যাই হোক, সে ছেলে। তার দেখতে হবে শুধু স্বাস্থ্য, দেখতে হবে, ঘর। কিন্তু, তাই-বা ক'জন দেখে ? তা দেখে দিলে আজ-কাল এই হাজার-হাজার মেয়ে আর বিধবা হতোনা। ছেলের আবার রূপ ? এ কি মেয়ে, যে আগে রূপ দেখতে হবে, তারপর দেনা-পাওনা ? কথাবার্ত্তা একরকম পাকা হয়েই গেছে। গরীব ইস্টিশানমাষ্টারের মেয়ে—দিতে-থুতে কিছু পারবে না। তা, সে দিক গিয়ে, আমি বউকে সাজিয়ে দিয়ে যাবো—সেজন্যে তাকে কিছু ভাবতে হবেনা বাপু।"

সোমেশ নিশ্চিন্তভাবে বললে, "বাঁচালে পিসীমা। আমার হঠাৎ যা ভাবনা হয়েছিল—বউয়ের এসে আগেই তো গয়না চাই। অথচ, 'মোটে মা রাঁধেনা, তার তপ্ত আর পান্তা!' একটি পয়সা নেই ঘরে, গয়না দেবো কি ক'রে! তুমি তবু ভারটা নিলে তাই নিশ্চিন্ত হয়েছি। আচ্ছা, আমি ঘরেই আছি, ওঁরা এলে খবর দিয়ো। হ্যাঁ, অভ্যর্থনা কি আমাকেই করতে হবে ?"

খুশী-মনে হেসে অনুপমা বললেন, "শোনো কথা। তুই যাবি কেন ? হারাধনই তাদের বসাবে, কথাবার্ত্তা বলবে, তারপর তোকে ডাকলে তখন তুই যাবি। হলোই বা তোর বাড়ী-ঘর,

তবু বিয়ের বর তো তুই। শ্বশুর, দাদাশ্বশুর আসবে—একটু লজ্জা-সরম করতে হয় বইকি।"

অতি নিরীহ ছেলের মত সোমেশ আবার ঘরে ঢুকলো, গায়ের জামা খুলে কৃষক-সমিতির কাগজ-পত্র নিয়ে বসলো। দেখতে-দেখতে সে কখন্ সব হারিয়ে তার মধ্যে ডুবে গেল তা সে নিজেই জানেনা।

হারাধন এসে ডাকে—"খোকাবাবু, ভদ্রলোকরা এসেছেন, তোমার বৈঠকখানায় যাওয়ার কথা দিদিমণি ব'লে দিলেন।"

সোমেশ অন্যমনস্কভাবে মুখ তুললে—মনে পড়েছে, তাকে দেখতে লোক এসেছে। গায়ে আবার জামাটা দিয়ে, চটি পায়ে সে বার হ'লো।

বৈঠকখানায় কয়েকজন লোক ব'সে। অপরিচিত একজন হলেও আর সবাই পরিচিত। এদেরই মধ্যে অঘোর চাটুয্যেকে দেখে সোমেশের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্যে বিকৃত হয়ে উঠলেও সে নিজেকে সামলে নিলে। অঘোরবাবু মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করলেন, "এসো বাবাজি—না, আর বাবাজি বলবো না, দাদামণি বলেই এবার হ'তে ডাকতে হবে। নাতজামাই হচ্ছো যে। তোমার পিসীমার, আমার নাতনীটিকে দেখে ভারি পছন্দ হয়েছে, এইমাসের মধ্যেই তিনি বিয়েটা দিয়ে যেতে চান। তোমার যে কোনো আপত্তি হবেনা তা জানি, তবু একবার বলা-কওয়া ভালো—তোমার নিজেরও একবার দেখে নেওয়া ভালো।"

মেঝেয়-পাতা মাদুরের একপাশে বসতে-বসতে সোমেশ বললে, "কোনো দরকার নেই, পিসীমা যা করছেন তাই হবে, আমার নিজের তরফ থেকে কোনো প্রশ্নও নেই, তার সমাধানের প্রচেষ্টাও নেই।"

অঘোরবাবু ভারি খুশী হয়ে হাসলেন, জামাতার দিকে ফিরে বললেন, "শুনলে তো কথা। লোকে তোমায় যে-যতই লাগাক বাবাজি, জেনো, সে-সব মিথ্যে কথা। বিয়েটা দিয়ে জামাইকে তুমি নিজের কাছে রেখো, রেলওয়েতেই কাজ ঠিক কোরো, তাহ'লে তো আর কোনো কথা হতে পারবে না?"

সোজা হয়ে ব'সে সোমেশ জিজ্ঞাসা করলে, "কথা মানে, কি কথা?"

অঘোরবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "ওসব পাড়াগাঁয়ের কথা ছেড়ে দাও বাবাজি, এরা হয়কে নয় করে—নয়কে হয় করে—এ দস্তুর তুমি তো জানোই। লোকে ওই পরেশ দাসের কথা নিয়ে অনেক-কিছু ঢালা-পাঁচা করে তো! ও কাকা আমাদের মাধববাবু পর্য্যন্ত বাদ যাননা! পরেশের স্ত্রীকে নিয়ে বড়ো কম কথা তো ওঠেনি!"

সোমেশের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, সে জিজ্ঞাসা করে, "কি রকম?"

অঘোরবাবু একবার চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, "তবে তোমায় সব কথাই বলি। পরেশের স্ত্রী নাকি কোন্ বাইজীর মেয়ে, সে বাইজী আমাদের এখানেও কতবার মুজরো নিয়ে এসেছিল, তারপর—"

সোমেশের দুই চোখে আগুন জ্বলে ওঠে, সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে—"নাঃ, একথা কেউ বলতে পারেনা, আপনিও একথা বলতে পারেন না—আমি আপনার একথা শুনতে চাইনা।"

তার কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ ঘরসুদ্ধ সবাই চমকে ওঠে।

"হতে পারে, দিদিমণি আপনাদের সঙ্গে ঠিক মিশতে পারেন নি, আপনাদের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রকৃতি মেলেনি। তাই ব'লে আপনারা একথা বলতে পারেন না—এ-রকম কথা তাঁর সম্বন্ধে বলা অন্যায়···অতি অন্যায়।"

সোমেশ গর্জ্জন করে।

অঘোরবাবু মুখ টিপে হাসেন—

"কিন্তু বাপু, তুমি-আমি অন্যায় বললেই-বা লোকে শুনবে কেন? তুমি জানো? পরেশের শাশুড়ীকে দেখেছো কখনো? পরেশের শাশুড়ী ছিল, বেলিনি-গাঁয়ের মেয়ে, ছোটবেলায় বিধবা হয়ে এক—"

"চুপ করুন—চুপ করুন—"

সোমেশ উঠে দাঁড়ালো, রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "আপনার কাছে হাত যোড় করছি, আপনি একজন সতী-সাধ্বীর নামে এসব কেচ্ছা গাইবেন না। এতে আপনার কোনোদিক দিয়ে কোনো লাভ হবেনা, অথচ ওদের নিদারুণ ক্ষতি হবে।"

অঘোরবাবুও উঠে দাঁড়ালেন, রুক্ষভাবে বললেন, "তুমি কি মনে করছো আমি মিছে কথা ব'লে আসর গরম করছি? শোনো-হে ছোকরা, অঘোর চাটুয্যের সাতপুরুষ কেন, চৌদ্দপুরুষ

এ-গাঁয়ে বাস করেছে, কারও চালায় মাথা দিয়ে সে বাস করেনা। তোমার বাবা আমায় চিনতো, আমার কথা বেদ-বাক্যি ব'লে মানতো। আমি মিথ্যে কথা বলছি, এতবড়ো কথা তোমার বাবা পর্য্যন্ত বলতে পারেনি, তুমি তো ছেলেমানুষ, সেদিনকার ছেলে—তুমি আর কি জানবে? থাকতো আজ পরেশের শাশুড়ি, সব ঠিক ক'রে দিতুম। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়বার আগেই যে সে স'রে পড়লো!"

একমুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, "লোকে বলে না, পাপের কড়ি থাকেনা? তাই তার দেহ-বিক্রির অনেক টাকা ওরা পেলেও, একটি পয়সাও আজ নেই। পরেশের পিতৃগোষ্টিও পাপ করেছে বড়ো কম নয়। সেইসব পাপে আজ হাতে পেয়েও সব হারিয়েছে। আজ কিনা, রোগের পথ্যি-ওষুধ জোটাতে পারেনা। যাক, আমি আর কিছু বলতে চাইনা। আমি আগেই বলেছিলুম তুমি কোনোদিন ওদের ছাড়া পারবেনা —হলোও ঠিক তাই। ওঠো হে নগেন, এ-পাত্রের আশা ছেড়ে দাও। বাবাজীর ঘাড়ে যে পেতনী চেপেছে, সে পেতনী নামাবার ক্ষমতা আর যারই থাক—আমাদের নেই।"

নির্ব্বাকে একে-একে সব উঠে গেল। নিস্তব্ধে ব'সে রইলো একা—সোমেশ।

দশ

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তরে গেছে।

জ্যৈষ্ঠমাস কবে এসেছে তার হিসাবও কেউ রাখেনা। ঘরের সামনে বারান্দার নীচে রজনীগন্ধা ফুটেছে···একটা সারিতে অসংখ্য রজনীগন্ধার সারি। অন্ধকারের মধ্যে সাদা-ফুলের ঝাড়গুলি স্পষ্ট না হলেও, দেখা যাচ্ছে।

বারান্দায় অন্ধকারে ব'সে আছে পরেশ—নীচে মাদুর পেতে তার পাশে বরুণা সেতার বাজাচ্ছে।

হ্যাঁ, এই একটিই বিলাসিতা আছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। সাংসারিক-গোলমালে যখন এরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন বরুণা বসে সেতার নিয়ে, আর, পরেশ সেই সেতারের টুং-টাং শব্দের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এছাড়া আরও একটি বিলাসিতা তাদের আছে, সেটি হচ্ছে—রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা, সঞ্চয়িতা প্রভৃতি কবিতার বই পড়া।

বরুণা সেতার বাজাচ্ছে।

অনেকদিনের হারানো একটি সুর···কান্নাভরা সুর···শুনতে-শুনতে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে—মনে হয়, কি যেন হারিয়ে গেল, সারাজীবন প্রতীক্ষার পরে যা পাওয়া গিয়েছিল, পথ চলতে কোথায় প'ড়ে গেছে।

আত্মহারা পরেশ। তার দু'চোখে ঘুম যেন জড়িয়ে আসে। সে বুঝতে পারেনা, কখন সে সুর থেমে গেল···

বরুণাও সেতার কোলে ক'রে কোন্ এক অতীত-স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেছে।

উঠোন দিয়ে কে যেন এগিয়ে আসে···নিঃশব্দ তার চলা···

"পরেশদা ?"

হঠাৎ এই আহ্বানে পরেশ চমকে ওঠে—কে ডাকে ? মরা-অতীত কি মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে ? নরেশ কি ফিরে এলো, আন্দামান হতে ? দুস্তর সমুদ্র পার হয়ে এসেছে সে। মাথা দিয়ে···গা দিয়ে···নোনা-জল টুপিয়ে পড়ছে···

"হ্যাঁ, আমি আছি নরু, এই যে, বসেই আছি তোর প্রতীক্ষায়।"

কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ তার সহজ-চেতনা ফিরে আসে···

নরেশ—নরু—নাঃ, সে কি আর আছে ? সে সে-যুগের টেরেরিষ্ট-আন্দোলন যখন হয়েছিল, তখনই হয়ে গেছে তার জীবনের সমাপ্তি। শেষ যবনিকা প'ড়ে গেছে—পূর্ণচ্ছেদ তার ঘটেছে। সে আজ কতবছর হলো ? প্রায় আট-দশবছর হলোনা কি—বাংলার কেন, সমগ্র ভারতের সন্ত্রাসবাদীর বিলোপ হয়েছে ? অপরাধ···তাদের কি ছিল অপরাধ ?

"পরেশদা, আমি সোমেশ।"

পরেশ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে—"ও, সোমেশ ? আমার কেমন যেন ঘুম এসেছিল, বরুণার সেতার বাজানো শুনতে-শুনতে। এসো এসো, বিকেল হতে তোমারই প্রতীক্ষা করছিলুম।"

চিরবাঞ্ছিতা

বরুণা সেতারটাকে নামিয়ে রেখে নিজে স'রে বসলো, বললে, "ব'সো সোমেশ, মাদুর পাতাই আছে।"

একপাশে সোমেশ বসলো।

"সেতার বাজাচ্ছিলেন দিদিমণি? থামলেন কেন? বাজান্—বাজান্!"

পরেশ বললে, "মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ, বরুণাকে তাই সেতারটাকে নিয়ে বসতে বললুম। জানো, সোমা—সেতার-এস্রাজ-বেহালায় বরুণার হাত ভারি সুন্দর। ওর মা, মানে আমার শাশুড়ী, তারের বাজনা এত সুন্দর বাজাতে পারতেন—অমন কোথাও শুনিনি। বরুণার শিক্ষা ওর মায়ের কাছে। অন্য কারুর কাছে নয়।"

মায়ের কাছে শিক্ষা?

কথাটা ধ্বক ক'রে বুকে বাজে।

অঘোরবাবুর কথাটা মনে হয়—বরুণার মায়ের সম্বন্ধে কুৎসিত সেইসব মন্তব্য···

কথাগুলো কি সত্যি?

সোমেশ অন্যমনস্কভাবে বললে, "হ্যাঁ, তারের বাজনা শুনতে খুব ভালো, খুব নরম হাত চাই বাজাতে। আচ্ছা, থাক্ এখন দিদিমণি, অনেকক্ষণ বাজিয়েছেন, একটু বিশ্রাম নিন। ততক্ষণে আমাদের কথাবার্ত্তাগুলো শেষ ক'রে ফেলি।"

পরেশ বললে, "বিকেলে আসছি ব'লে সেই যে গা-ঢাকা দিলে, আর তোমার দেখাই নেই। কারণটা কি বলো দেখি?

একদিন গেল, দুদিন গেল, আজ তৃতীয়দিনে এই রাত্রে তুমি এসে হাজির। খাওয়া হয়েছিল কোথায়, শুনি?"

সোমেশ হেসে ফেললে, বললে, "গিয়েছিলুম কলকাতায়। কাল বিকেলে গিয়ে পিসীমাকে পৌঁছে দিয়ে, রাত্রের মেলেই ফিরেছি।"

বিস্মিত হয়ে পরেশ বললে, "তাঁর তো এত শিগগীরই যাওয়ার কথা ছিলনা, আর কয়েকটা দিন থেকে যাওয়ার কথা শুনেছিলুম যে।"

সোমেশ আবার হাসে—

"ওসব রাজা-রাজড়ার মর্জি পরেশদা···তোমার-আমার সঙ্গে মোটেই মিলবে না। আসল কথা কি জানো? বলি তবে শোনো। আসল কথা— আমার বিয়ে।"

"বিয়ে? তোমার?"

পরেশের উক্তির সঙ্গে-সঙ্গে বরুণার কণ্ঠস্বরও শোনা গেল, "তোমার বিয়ে? বেশ কথা যে। তা তো কিছু বলোনি?"

সোমেশ বললে, "আপনাদের কপালে নেমন্তন্নটা আর জুটলো না দিদি। বিয়ে এলো, আবার ভেঙেও গেল। পিসীমার হলো তাতে যত-না রাগ, তত-না দুঃখু। তাই দপ ক'রে জ্বলে উঠলেন। হুকুম করলেন, 'আমায় দিয়ে আয় বাপু।'—তাই-না যেতে হলো।"

পরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "বিয়েটা হচ্ছিলো কোথায়?"

সোমেশ উত্তর দিলে, "কে জানে? সে-সব পিসীমাই জানতেন। যাক গিয়ে—যা গেছে তা যাক, ওর জন্যে আর

দুঃখ ক'রে কোনো লাভ নেই। সোজা কথায় ব'লে দিয়েছি, গণকে আমার হাত দেখে বলেছে, বিয়ে আমার হবেনা, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য সাধনা ক'রে কাটিয়ে দেবো। সত্যি, কি দরকারই-বা সংসার পেতে? বেশ আছি—খাচ্ছি-দাচ্ছি বেড়াচ্ছি।"

পরেশ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো, তারপর আস্তে-আস্তে বললে, "তাহ'লে গণকের গণাটাই ঠিক হবে, কি বলো?"

সোমেশ হাত বাড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে সাদা একটা রজনীগন্ধার গুচ্ছ তুলে নিলে, বললে, "বিয়েটাই মানুষের জীবনে চরম লাভ নয় পরেশদা— তার চেয়ে, না করাই ভালো। দুনিয়ায় বিয়ে করে শতকরা নিরেনব্বুইজন—একজন নাহয় বাদই পড়লো। সংসার ওই নিরেনব্বুইজনকে নিয়েই সুখী হোক। যাক গিয়ে, ওসব কথা বাদ দাও। উড়ো-আপদ অমন কত আসবে—কত যাবে। হ্যাঁ, শোনো এখন। আমি জামদানী-বিষ্টুপুর গিয়েছিলুম, ওদিকে অনেক গ্রাম দেখা হলো, সবই চাষীপ্রধান গ্রাম। দেখলুম, ওরা যা বলেছে জমিদারের সম্বন্ধে, তা এতটুকু মিথ্যে নয়।"

পরেশ বললে, "আমি তা জানি, আর জানি বলেই তোমায় একবার ঘুরে আসতে বললুম, তাহ'লে তুমি গরীব চাষার দুঃখ-বেদনা কতকটা অনুভব করতে পারবে। এইজন্যেই তোমাকে আমার পাঠানো।"

সোমেশ বললে, "সঙ্গে-সঙ্গে মিল-অঞ্চলও ঘুরে এলুম পরেশদা। দেখলুম, এরা বেশ আছে। দিন গেলে, হপ্তা গেলে,

কেউ-কেউ মাস গেলে মাইনে পায়…প্রথম দু'একদিন রাজার হালে কাটিয়ে, তারপর যেমন করেই হোক দিন চালায়। আছে বেশ, দেখে হিংসে হয়।"

বরুণা ঘর হতে আলোটা বারান্দায় আনতেই সোমেশ চেঁচিয়ে উঠলো—"আবার, আলো কেন? অন্ধকারেই তো বেশ থাকা গেছে। ঠাণ্ডা অন্ধকার, ঠাণ্ডা হাওয়া, তার ওপর ঠাণ্ডা রজনীগন্ধার গন্ধ,—এর মধ্যে এই আলোটা এনে ফেলে আপনি সব মাটি ক'রে দিলেন দিদিমণি।"

বরুণা একটু হেসে লণ্ঠনটা দরজার ভেতর দিকে সরিয়ে রাখলে; তারপর বললে, "এবার কি ওই কাজ করতে ইচ্ছে হয়েছে ভাই?"

সোমেশ বললে, "মনটাকে এমনভাবে গ'ড়ে ফেলেছি দিদি, এঁটে-লেগে কিছুতেই থাকতে পারিনা। দু'দিন একটা কাজে লেগে থাকতে-থাকতে একদিন টেনে ছুট দিই—এ-না হয়েছে, মুস্কিল! আজ ক'টা মাস এখানে আছি, আর ভালো লাগছে না। একটা নতুন-কিছু করবার ইচ্ছে মনে জাগছে। একঘেয়ে গ্রামে থাকা আর ভালো লাগছে না।"

বরুণা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করে, "কি নতুন কাজ করবে মনস্থ করেছো, শুনি?"

অন্ধকারে সোমেশ বরুণার পানে তাকায়, বলে, "সেইটেই এখনো ঠিক করতে পারিনি দিদি। কখনো মনে হয়, জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতার কেটে চ'লে যাই দেশ হতে দেশান্তরে, কখনো মনে

হয়, এরোপ্লেনে উড়ে বেড়াই, কখনো মনে হয়, গেরুয়া প'রে লোটা-কম্বল-চিমটে সম্বল ক'রে বার হয়ে পড়ি—হিমালয়ের পথে। মনে জাগছে অনেক-কিছু, কিন্তু কি যে করবো তাই ঠিক করতে পারছি না। তবে, শেষেরটি অর্থাৎ, প্রব্রজ্যার দিকেই মনটা যেন টানছে বেশী। একদিন হয়তো সবাই দেখবে—জয় বাবা বিশ্বনাথ, ব'লে বার হয়ে পড়েছি।"

বরুণা খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে, গম্ভীরপ্রকৃতি পরেশ পর্য্যন্ত হাসি সামলাতে পারেনা।

বরুণা হাসি থামিয়ে বললে, "তোমার আর-সব রূপ কল্পনা করতে পারি সোমেশ-ভাই, কিন্তু ওই বৈরাগ্যটাকে একেবারে কল্পনা করতে পারিনা।"

উত্তেজিত হয়ে সোমেশ বললে, "আচ্ছা, আপনি দেখে নেবেন দিদি, সন্ন্যাসী যেদিন হয়ে যাবো সেদিন আপনাকে আমি রূপখানা দেখিয়ে যাবো। হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই সেদিন আপনি আমায় দেখে চিনতে পারবেন না।"

বরুণা একমুহূর্ত্তে গম্ভীর হয়ে ওঠে।

"কিন্তু সোমেশ-ভাই, আমি তখনও বিশ্বাস করবো, তোমার দেহ বৈরাগ্য নিলেও মন বৈরাগ্য নেয়নি। কে বলতে পারে, আইনগর্হিত কোনো কাজ ক'রে আত্মগোপন করবার জন্যেই তুমি সন্ন্যাসী বেশ ধরবে কি না? আমাদের এদেশে ওই সন্ন্যাসীর পোষাকটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিনা…ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, যেখানে হোক জায়গা মিলবে—খাওয়াটাও মিলবে। আমরা যতই

শিক্ষার আড়ম্বর করি, যতই এগিয়ে চলি, ভারতের সেই ভাবটা কোনোদিন মন হতে মেলায়না কিনা—তাই আজও সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে এ-দেশবাসীর মন এতটুকু আকৃষ্ট হয় বইকি। আমি কখনো একথা স্বীকার করবো না, সত্যিকার বৈরাগ্য নিয়ে তুমি গেরুয়া প'রে চলেছো। বলবো, নিজেকে লুকিয়ে রেখেছো ওই গেরুয়ার আড়ালে, এর ভেতর হতে কাজ ক'রে যাবে।"

সোমেশ হাসছিল, বললে, "কেন, সন্ন্যাসীর কাজ নেই বুঝি? তার কাজ অনেক বড়ো। সম্পূর্ণ পারলৌকিক।"

বরুণা বললে, "কিন্তু, এ-সন্ন্যাসীর কাজ হবে সম্পূর্ণ ইহলৌকিক। এর উদ্দেশ্য হবে শুধু প্রচার···শুধু সঙ্ঘবদ্ধ করা জনগণকে।"

পরেশ হাত তুললে, "বাজে কথা এবার থাক বরুণা, কাজের কথায় এসো।"

সোমেশ নিস্পৃহভাবে বললে, "কিন্তু, তুমি যে তোমার কাজ সবই ঠিক ক'রে ফেলেছো পরেশদা! এই ঘরে শুয়ে, গদ্দখালির হাতের মতন হাত বাড়িয়ে আধমাইল দূর তেঁতুলগাছের তেঁতুল পেড়ে এনে দেবে—তোমার অসাধ্য কাজ তো কিছু নেই। আজ, নাইবা রইলো দৈহিক-শক্তি···প্রাণশক্তিতে এত বলবন্ত তুমি যে, সব-কিছুই এখন 'থোড়াই কেয়ার' করো।"

পরেশ তার ভেতরকার গরমভাব বুঝতে পারে—হাত বাড়িয়ে সোমেশের পুষ্ট একখানা হাত সে নিজের হাতে তুলে নিয়ে তার ওপর হাত বুলোয়। কতকক্ষণ নিস্তব্ধ-বৃত হাতখানার ওপর

হাত বুলোতে-বুলোতে সে বললে, "সে কথাটা সত্যি সোমা। দৈহিক-শক্তি না থাক, প্রাণশক্তি আমার প্রচুর···পর্যাপ্ত। কিন্তু, কেবল একটা শক্তির ওপরই তো নির্ভর করা চলেনা ভাই! আমার ইচ্ছা কাজ করে আমার মনের মধ্যে, কিন্তু তার আসল কাজ যে, বাইরে প্রকাশ হওয়া—ভেতরে ধ্বংস হওয়া নয়! বরুণাকে আমি আমার ইচ্ছায় গ'ড়ে তুলেছি, শেষকালে ওকেই আমি আমাদের নেত্রী করলুম সোমেশ।"

সোমেশ যেন আছাড় খায়—"নেত্রী, আমাদের? মানে; আমাদের সমিতির? কি বলছো পরেশদা?"

পরেশ বললে, "উপায় নেই—কিছুমাত্র উপায় নেই। কেবল মন দিয়ে তো কাজ হয়না ভাই, এই দেহের শক্তি, চলাফেরার ক্ষমতা আর আমাদের সমিতি বা সঙ্ঘের ভার নেওয়ার জন্যে একদিন আমি জনে-জনে সকলকে অনুরোধ করেছি—তুমি, সত্রাজিত, সুজিত, মনোহর প্রভৃতিকে। কিন্তু, তোমরা সবাই হেসে আমার কথা উড়িয়ে দিলে। আমি তো জানি আমায় আর কতদিন বাঁচতে হবে? ঠিক দিন না বলতে পারলেও আন্দাজে ব'লে দেবো, আর দিন নেই সোমা, আমার দিন এগিয়ে এসেছে। বরুণা জোর ক'রে আমার হাত হতে এ-বোঝা নিয়েছে। বুদ্ধের কাছ হতে ভিক্ষুনী সুপ্রিয়া যেমন ক'রে দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা মেটানোর ভার নিয়েছিল, বরুণাও সেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমার খাতা, আমার ঝুলি নিজে নিয়েছে। উপায় নেই—আর কোনো উপায় নেই।"

চিরবাঞ্ছিতা

সোমেশ বিষণ্ণকণ্ঠে বললে, "কিন্তু, পারবেন কি দিদি? যে-কাজ করতে দৃঢ়চিত্ত পুরুষ পর্য্যন্ত বোঝার ভারে নুইয়ে পড়ে, পারবেন সে-কাজ করতে—সে-বোঝা বইতে?"

বরুণার ছুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অন্ধকারে তার কঠিন মুখ ও আগুন-ঢালা চোখ দেখতে না পাওয়া গেলেও, তার কঠিন কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"মেয়েদের চিরদিন পেছনে ফেলে রেখে এসেছো তোমরা পুরুষ, কর্ত্রীত্বতাকে দিয়েছো, ক্ষুদ্র সংসার-পালনের। সেই কর্ত্রীত্ব যে সমস্ত দেশে, সমস্ত লোকের পথেও ছড়িয়ে পড়তে পারে, তা আজ সামনে সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, মিথি বেণ, মৃদুলা বাইদের মতন মেয়েদের দেখে জানা উচিত ছিল ভাই। কেন, আমাদের বাংলাতেও অনেক মেয়ে নেই কি, যাঁরা দিনের পর দিন অত্যন্ত সহজভাবে অত্যাচার সয়েছেন, কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, অথচ আজও তাঁদের মেরুদণ্ড সোজা হয়েই আছে? আমি তাঁদের গোত্র ছাড়া নই সোমেশ, আমি আমার রুগ্ন-স্বামীর হাত হতে এ-দায়ীত্ব নিয়ে তাঁকে মুক্তি দিয়েছি। তিনি যে-ক'দিনই থাকুন, স্বচ্ছন্দে বাস ক'রে…জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন—আমি রইলুম, তাঁর কাজ আমি করবো।"

তার কথা বন্ধ হয়ে যায়, মুখখানা যেন অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায়।

চিরবাঞ্ছিতা

এগারো

সোমেশের কাছে এসেছে, সত্যবান ও মজিদ। হারাধন খুশী হতে পারেনা, এই দুটি ছেলেকে সে আদপে দেখতে পারেনা।

ফ্যাক্টরীতে এরা দু'জনেই কাজ করছে, আর ওখানে যে একটা গোলমাল বাধানোর চেষ্টা করছে, তা হারাধন সেদিন তার জামাই—দুলালের কাছে শুনেছে।

কিছুদিন আগে 'মিলে' এরা গোলমাল বাধিয়ে তুলেছিল, সৌভাগ্য যে, সকল লোক তাদের দলে যোগ দেয়নি। সেইজন্যেই 'ষ্ট্রাইক' সর্ব্বাঙ্গীন হয়নি। মাধব দাস এদের দু'জনকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, গ্রামে, বা, গ্রামের আশ-পাশে কোথাও এরা থাকতে পাবেনা এ-আইন জারি করা হয়েছে।

শ্রাবণের আকাশ দিনরাত ঘন মেঘে ঢেকে আছে, গত-কাল দিনরাত অজস্রধারে বৃষ্টি প'ড়ে পুকুর, খানা, ডোবা, যা যেখানে ছিল সব ছাপিয়ে গেছে। আজ বৃষ্টি ধরার মুহূর্ত্তে হারাধনও তার পোলো নিয়ে বার হয়েছিল মাছ ধরার চেষ্টায়। পুকুর ছাপিয়ে জল ছুটেছে পথের ওপর দিয়ে—দিক হতে দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। সাঁকোর নীচে দিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে জলপ্রবাহ ছুটছে নীচু মাঠের বুকে, সেখানেই চলেছে মাছধরার সমারোহ।

ভেসে চলেছে কই, ষোল, চ্যাং, পুঁটি—পুকুরে-ফেলা পোনা-মাছও নাকি তার মধ্যে আছে। গ্রামের ছেলে-বুড়ো সব ছুটেছে দিক-দিগন্তরে, যে যেখান হতে পাচ্ছে, মাছ সংগ্রহ করছে।

এই সন্ধ্যার সময় হারাধন এক-চুপড়ি মাছ এনেছে। বেশীর ভাগই তার কই, শিঙ্গি, মাগুর। একটা কলসীতে মাছগুলো জিইয়ে রেখে সে বড়ো-বড়ো কয়েকটা কইমাছ কুটতে বসেছে—রান্নাঘরে ভাত চড়ানো হয়েছে।

এগারোবছরের নাতি, বাদলা আজ এসেছে। দেশে তারা কয় ভাই-বোন আর মা নাকি খেতে পাচ্ছেনা। দুর্ভিক্ষ ভীষণ রকম লেগে গেছে। পরনে কারও একখানা কাপড় নেই, এই অবস্থার কথা বাপকে কতবার তারা পত্র লিখে জানিয়েছে, কিন্তু দুলাল একখানা পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেয়নি।

তাই মাকে লুকিয়ে এগারোবছরের ছেলে বা[illegible] পালিয়ে এসেছে।

রাস্তাটিও তো বড়ো কম নয়। কাটোয়া হতে হাওড়া, হাওড়া হতে শেয়ালদা পর্যান্ত ওইটুকু ছেলে অচেনা-পথে কি ক'রে যে এলো, তাই ভেবে হারাধন একেবারে অবাক হয়ে যায়। বাদলা তার জীবনে কখনও রেলে ওঠেনি, কলকাতা সহর চেনেনি। সেই ছেলে শেয়ালদায় এসে কেমন করেই-বা এ-ট্রেন চিনলে, কি-করেই-বা এই ইষ্টিশানে নেমে এই পাক্কা পাঁচ-সাত কোশ পথ হেঁটে এলো ?

চিরবাঞ্ছিতা

প্রথমে সে মিল-কলোনীতেই বাপের সন্ধানে গিয়েছিল, কিন্তু বাদলার বাবা তাকে দেখে মোটেই খুশী হয়নি। যাওয়ামাত্র সে নিজের অসুস্থতার অছিলায়, তার বন্ধু রহমনকে দিয়ে বাদলাকে তার দাদামশায়ের কাছে পাঠিয়েছে।

হারাধন একেবারে আঁতকে ওঠে তার আসার কাহিনী শুনে। বাবাঃ, কি ছেলে রে! পথে যদি গাড়ী চাপা পড়তো, ছেলেধরারা ধ'রে নিয়ে গিয়ে যদি আসামের চা-বাগানে পাঠাতো—কি হতো তাহ'লে?

বাদলা তার মণিপুরী-প্যাটার্ণের মুখে কুত্‌কুতে চোখ দুটি পিট্‌পিট্ ক'রে হাসে—"ইঃ, ধরা বললেই ধরা কিনা! আমায় ধরতে পারে এমন লোক নেই গো দাদু! কাটোয়া হ'তে গার্ড-সাহেবকে বাবা ব'লে হাওড়া পর্য্যন্ত এসেছি,—গার্ডসাহেব আমায় বাড়ীতে চাকর রাখবে, ভালো-ভালো খাওয়া-পরা দেবে—কতো কথা বলেছে। নিজে যা খেয়েছে, আমাকেও তাই খাইয়েছে, টিকিট নেওয়া তো দূরের কথা। হাওড়ায় এসে আমি একেবারে বেমালুম স'রে প'ড়ে বাইরে এসেছি, সোজা লোককে জিজ্ঞেস ক'রে বাসে উঠেছি, তারপর কলকাতার ইষ্টিশানে এসে গাড়ীতে উঠেছি। ইঃ, আমি নাকি গার্ডসাহেবের বাড়ীতে চাকর থাকবো? চাকরি আমি জানি নাকি?"

হারাধন প্রশংসার চোখে নাতির পানে তাকায়—"নাঃ, এগারো বছর বয়েস হ'লে কি হবে—দুর্দ্দান্ত বুদ্ধি আছে। এ-ছেলে মানুষ হবেই।"

সোমেশকে সে জানিয়েছে, তার নাতি এসেছে, এখানেই এখন দু'চার দিন থাকবে, সোমেশের ফাই-ফরমাস যা-কিছু, সবই সে করবে।

রান্নাঘরে বাদলা উনুনে জ্বাল দিচ্ছিলো। বারান্দায় হারাধন ল্যাম্প জ্বেলে মাছ কুটছিল।

দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করলে—"কে ?"

উত্তর না পেলেও, কড়া-নাড়ার শব্দ—বাড়ে ছাড়া কমেনা।

বিরক্ত হয়ে হারাধন দরজা খুলতে ওঠে।

এই দারুণ বর্ষায় একটি লোক পথে বার হতে পারছে না, সোমেশের মতন দুর্দ্দান্ত লোকও আজ বাড়ীতে বন্দী হয়ে আছে, এইসময় এই ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে কোথাও এক-হাঁটু, কোথাও এক-কোমর জল কাটিয়ে কে এলো ?

দরজা খুলতেই হাতের ল্যাম্পের আলো, দরজার ও-ধারে যে দুটি মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়লো, তাদের দেখে হারাধন মোটেই খুশী হতে পারলে না।

শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কি চাই ? কাকে চাই ?"

মজিদ একটু হেসে বললে, "চাই তোমার বাবুকে। তোমাকে নয়।"

"কিন্তু, বাবু তো বাড়ী নেই, বাবু বাইরে—"

সত্যবান প্রচণ্ড ধমক দেয়—"শাট্‌আপ্‌ বুড়ো। তোমার বাবু ওপারের ঘরে ব'সে কি পড়ছে, আমরা তা জানলা দিয়ে দেখেছি। যাও, খবর দাও গিয়ে তোমার বাবুকে, আমরা দেখা করতে চাই।"

হারাধন একেবারে জ্বলে ওঠে, চট্ ক'রে সে দরজাটা বন্ধ করতে যায়, রুক্ষকণ্ঠে বলে, "তুমি মুখ সামলে কথা বলে বলছি। বাড়ী বয়ে বড়ো যে তেজী-কথা শোনাতে, —আচ্ছা দেখছি!"

সত্যবানের মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে, বলে—

"তাকাও—তাকাও বুড়ো, সামনের দিকে···"

চোখ তুলতেই কপালের ওপর উদ্যত রিভলভার দেখে বৃদ্ধ হারাধন থরথর ক'রে কাঁপে, তার কম্পিত হাতখানা হতে ল্যাম্পটা মাটিতে প'ড়ে নিবে যায়। তারপর সভয়ে যখন সে সরতে গেল, চেঁচাতে গেল—"ডা—ডা—ডা···"

তখন 'ডাকাত' কথাটা তার আর বলা হলোনা, তার পাশ কাটিয়ে সত্যবান ও মজিদ ততক্ষণ ঢুকে পড়েছে···সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

নীচের ব্যাপার সোমেশ জানেনা।

মেঝেয় একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে, বুকে একটা বালিস দিয়ে উপুড় হয়ে প'ড়ে সে যে-বইখানা পড়ছিল সেখানার নাম, 'রেভোলিউশান।' অত্যন্ত নিবিষ্ট হয়ে সে পড়ছে।

এই জল-বৃষ্টির মধ্যে সারাদিন আজ সে পরেশের বাড়ীতে ছিল, ওখানেই খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। কলকাতা হতে পরেশের ছু'চারজন বন্ধু তাকে দেখতে এসেছিল, তারা প্রচুর ইলিশমাছ এনেছিল, বরুণার একান্ত জিদে তাই আজ সোমেশকে সেখানেই থাকতে এবং খেতে হয়েছে। সন্ধ্যের একটু আগে সে বাড়ীতে

ফিরেছে, তারপর চা খেয়ে, পরেশের কাছ-হতে-আনা বইখানা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে।

"সোম, ঘরে আছো?"

দরজার বাইরে এই আহ্বান শুনে সোমেশ ধড়ফড় ক'রে উঠে পড়ে—"কে?"

"আমি—আমি সত্যবান।"

"আর, আমি মজিদ।"

সঙ্গে-সঙ্গে দু'জনেই ঘরে ঢুকলো।

এদের দু'জনকে দেখে সোমেশ যে মোটেই খুশী হয়নি তা তার বিকৃত মুখ দেখেই বোঝা গেল। অপ্রসন্নমুখে যথাসাধ্য প্রশান্তির ভাব ফুটিয়ে সে বললে, "ও. তোমরা—একেবারে মাণিকজোড়? বহুকাল পরে দেখা। আর যে কোনোদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে এ-আশা আমি করতে পারিনি। এসো, এখানে ব'সো।"

সতরঞ্চির ওপর সে দু'জনকে বসালে।

মজিদ ও সত্যবান—

এরা ছিল সেদিনে স্বদেশী-ডাকাত নামে খ্যাত। এদের দলে বড়ো কম লোক ছিলনা, এদের জীবনে এরা এমন কাজ নেই যা করেনি। এরা বহুবার জেল খেটেছে, বিভিন্ন জেলে কয়েদীদের মধ্যে বিদ্রোহ জাগিয়েছে। ট্রেন লুঠ এবং ধ্বংস—সোজাকথায় কয়েকটি ডাকাতি-মামলায় জড়িয়ে সোমেশ, পরেশ প্রভৃতি যে দীর্ঘ কয়েক-বছরের জন্যে জেলে গিয়েছিল, সেই দলেই ছিল মজিদ ও সত্যবান।

নৃশংসতায় এদের জুড়ি মেলা ভার, এদের কাজের কথা মনে করতে আজও সোমেশ শিউরে ওঠে।

জীবনকে সে নতুন ধারায় প্রবর্ত্তিত করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছে পুরোনো বন্ধুদের সে চিনেছে, এদের প্ররোচনায় অনেক-কিছু কাজ সে-ও করেছে।

কিন্তু, আজ ?

আজ, অ্যানার্কিজম বিদায় নিয়েছে—আর তার কোনো দরকার নেই। গণচেতনা জেগেছে—সবলেই আজ যখন বুঝতে পেরেছে, তখন ভয় জাগানো এবং সঙ্গে-সঙ্গে সর্ব্বনাশ করবার কোনো দরকার নেই।

সেদিন যারা ছিল, সন্ত্রাসবাদী—দীর্ঘ জেলবাসের ফলে তারা অনেকেই আজ ধারা বদলেছে। আজ এসেছে, রাশিয়ার কমিউনিজম। যার মধ্যে আছে চাষী-মজুর সব—সকলের স্বার্থ নিয়ে যারা দাঁড়িয়েছে সেই কমিউনিষ্ট সম্প্রদায়।

সোমেশ সন্ত্রাসবাদীর দল ত্যাগ করেছে, সে নীতি বদলেছে, সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কিষাণ-মজুরদের মধ্যে। আজ দেশকে বাঁচাতে—জাতিকে বাঁচাতে গেলে আগে এদের বাঁচানো দরকার।

সত্যবান একবার ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে, বললে, "তুমি মোটেই ভাবতে পারোনি আমরা আজও আছি। ভেবেছিলে, আন্দামানেই আমাদের জীবনের সমাপ্তি হয়ে গেছে, ওখানকার কবরখানায় আমরা ঘুমোচ্ছি। অবশ্য, সেটা ভাবাটাও বিচিত্র নয়। চিরকালের জন্যেই আমরা সাতজনে গিয়েছিলুম,

আর মধ্যে ফিরেছি মোটে তিনজন। চারজন সেখানে চিরবিশ্রাম লাভ করেছে।"

সোমেশ বললে, "তোমাদের দু'জনকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আর-একজন কে?"

সত্যবান বললে, "আর-একজন, জয়দ্রথ। সে হয়েছে, গভর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র। কথাটা বুঝতে পেরেছো?"

সোমেশ বললে, "বুঝেছি।"

সত্যবান দাঁতের ওপর দাঁত রাখে—"কিন্তু, তার চরম শাস্তির দিন এগিয়ে এসেছে...একসপ্তাহের ভার নিয়েছে আমাদের সবুর। একসপ্তাহ বাদে সংবাদপত্রগুলোই আমাদের জানাবে, জয়দ্রথ শর্ম্মা পরলোকের পথে যাত্রা করেছে।"

তারা দু'জনেই হাসে...টেনে-টেনে...অতি বিশ্রী...অতি কদর্য্য হাসি।

সোমেশ বললে, "আমি কিছুদিন আগে মিল-অঞ্চলে গিয়ে মজিদের মত একজনকে দেখে একবার সন্দেহ করেছিলুম, কিন্তু তখুনি ভেবেছিলুম, অসম্ভব। আজ ভাবছি, সত্যিই তোমায় দেখেছিলুম মজিদ, আমি ভুল দেখিনি।"

মজিদ উত্তর দিলে, "না, ভুল নয়। তুমি জানো আমার এই অঞ্চলেই বাড়ী...চাঁদপাড়া-ষ্টেশানে নেমে যেতে হয় প্রায় সাতমাইল পথ। আমি মুক্তি পেয়ে বাড়ীতে গিয়েছিলুম, সেখানেই ছিলুম, বছরখানেক আগে এখানকার মিলে কাজ করতে এসেছিলুম, এখানে এসে দেখা হলো, সত্যবানের সঙ্গে।"

সত্যবান বললে, "হ্যাঁ। তারপর মিল হতে আমরা তাড়িতও হয়েছি, আমাদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা আছে আমরা এসব জায়গায় আর আসতে পারবো না। আমরা জানি, পরেশ দাস এখানে আছে, তুমিও এখানে এসেছো,—তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে আমরা পরেশ দাসের সঙ্গে দেখা করবো ও কথাবার্ত্তা বলবো ব'লে এই দারুণ বর্ষার মধ্যে চোরের মতন নিজেদের লুকিয়ে এসেছি। আমরা শান্তশিষ্টভাবে সাধুর জীবন নিয়ে বাস করতে অভ্যস্ত নই। আমরা চাই বাঁচতে, সকলকে বাঁচাতে, তাই—"

সোমেশ বাধা দিলে, বললে, "তাই চাই আবার সেই কয়েকবছর আগের মতন বিপ্লব, নরহত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি। কিন্তু, ভুল করোনা সত্যবান। যার জন্যে এগুলো করার দরকার ছিল, আর তার দরকার নেই। আমরা সেদিন পথ নির্দ্দিষ্ট করতে পারিনি, তাই ভালোর নামে মন্দই ক'রে গেছি। আজ ভুল আমরা বুঝেছি, সেইজন্যেই সত্যিকার যা ভালো, যা করবে জনগণের প্রকৃত উপকার, সেইরকম কাজই করবো।"

সত্যবানের চোখ দু'টিতে আগুন জ্বলে।

"তাহ'লে কি বুঝবো, তুমি এ-পথ ছেড়ে দিয়েছো, শুধু কৃষক-মজুর নিয়েই কাজ ক'রে যাবে?"

সোমেশ শান্তকণ্ঠে বললে, "অর্থাৎ, যাতে জনগণের প্রকৃত উপকার হয় সেই কাজ করবো।"

সত্যবান উঠে দাঁড়ালো, সঙ্গে-সঙ্গে মজিদও উঠলো।

"আচ্ছা, আজ আসি সোমেশ, পরেশদার সঙ্গে একবার দেখা

ক'রে তাঁর মতটা জানি। আজকের দিনটা ছাড়া আর দিন পাবোনা। এ-অঞ্চলে দেখতে গেলেই, ধরা পড়বো কিনা—"

সত্যবান ও মজিদের সঙ্গে-সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে সোমেশ বললে, "আজ আমাদের সামনে এসেছে যে দিন, এ-দিনে রেভোলিউশানের দরকার থাকলেও, আগে জনগণকে তৈরী করতে হবে। যারা আজও পিছিয়ে প'ড়ে আছে, তাদের ডাক দিয়ে আনতে হবে সামনে, ওদের গ'ড়ে তুলতে হবে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে। শুধু তুমি-আমি বা মজিদ, বিপ্লবকে চালু রাখতে পারিনা সত্যবান! আমাদের দলে যারা ছিল, আজ তাদের আমরা হারিয়েছি।—তারা কেউ ঝুলেছে ফাঁসিকাঠে, কেউ মরেছে গুলিতে, কেউ গেছে জেলখানায়, দ্বীপান্তরে। আমরা বেঁচে আছি যে দু'চারজন, আমাদের শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই, সাহস থাকলেও আমরা কাছে এগিয়ে যেতে গিয়ে থেমে যাই। তোমরা যাচ্ছো পরেশদার কাছে, যাও, কিন্তু, গিয়েও বিশেষ কিছু হবেনা এটুকু জেনে রেখো।"

সত্যবান দমেনা, বলে, "দেখা যাক।"

তারা দু'জনে বার হয়ে গেল।

দরজা বন্ধ ক'রে ফিরতে গিয়ে সোমেশ দেখলে, বিবর্ণমুখে হারাধন দাঁড়িয়ে আছে, যেন সে সামনে ভূত দেখেছে।

সোমেশ বললে, "কি হ'লো হারাধন?"

হারাধন চাপা-সুরে বললে, "ওই লোক দুটো খোকাবাবু··· বারণ করছি ওদের সঙ্গে মিশোনা···ওরা সাংঘাতিক লোক।

ওদের কাছে পিস্তল আছে, আমি ভাগিয়ে দিতে চেয়েছিলুম, আমার কপালে ওরা পিস্তল তুলেছিল।"

ভয়ে তার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল।

সোমেশ একমুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, তারপর বললে, "বুঝেছি। আচ্ছা, আমি এরপর দেখবো হারাধন, ওরা আর এখানে যাতে না আসে তার ব্যবস্থা করবো। তুমি যাও, রাঁধো গিয়ে।"

সে সিঁড়িতে উঠছিল।

"খোকাবাবু ?"

হারাধনের ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে সোমেশ দেখলে, হারাধন চোখ মুচছে।

উৎকণ্ঠিত সোমেশ জিজ্ঞাসা করলে, "কাঁদছো কেন হারাধন ?"

তার হাতখানা কম্পিত-হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে হারাধন রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "খোকাবাবু, ওরা হচ্ছে—স্বদেশী-ডাকাত। ওই লোকটাকে আমি দেখেই চিনেছি। তোমায় বারণ করছি, আমার দিব্যি, তুমি ওই ডাকাতদলের সঙ্গে মিশোনা। তুমি গাঁয়ে এসে যেমন কাজ করছো চাষা-ভূষোদের নিয়ে, তাই করো, এতে সত্যি এদের উপকার হবে, দেশের কাজও হবে। এইসব ডাকাতদলের সঙ্গে মিশে—"

বাষ্পাবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়।

সোমেশ অভিভূত হয়ে পড়ে।

বৃদ্ধ হারাধনের শীর্ণ শিরওঠা-হাতের ওপর হাতখানা বোলাতে-

বোলাতে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে, "না, না, একবার ছোট-বয়েসে খেয়ালের ঝোঁকে যা ক'রে ফেলেছিলুম, বড়ো হয়ে, জ্ঞানবুদ্ধি লাভ ক'রে আর কি তা করতে পারি? এই কথা দিচ্ছি হারাধন, তুমি দেখো, আমার কথার খেলাপ হবেনা।"

হাসিমুখে সে সিঁড়িতে উঠতে লাগলো।

বারো

পরেশ বলে, "জানো সোমেশ, ওরা এসেছিল।"

সোমেশ জানে, তবু অজানার ভাণ ক'রে বললে, "কারা এসেছিল?"

পরেশ বললে, "সত্যবান আর মজিদ।"

সোমেশ জিজ্ঞেস করলে, "কি মন্ত্র দিলে?"

পরেশ বিস্ময়ে সোমেশের পানে তাকিয়ে থাকে— "মন্ত্র?"

সোমেশ উত্তেজিতকণ্ঠে বললে, "ওরা এসেছিলো, উত্তেজনার বাণী ছড়াতে, সে-যুগের নীতি আওড়াতে, যে-যুগের নীতি আমরা—বিশেষ ক'রে তুমি মনে-প্রাণে গ্রহণ ক'রে আজ সবদিক দিয়ে রিক্ত হয়ে ব'সে আছো পরেশদা। কাল রাত্রে তোমার এখানে মিটিং ছিল, সেই মিটিংয়ে যোগ দিতেই তো ওরা এসেছিল? কিন্তু আমার একটা নিবেদন আছে পরেশদা।"

"নিবেদন—"

পরেশ টুকরো-টুকরো হাসে।

সোমেশ বলে, "নিবেদন ছাড়া আর কি বলবো, বলো? দিদি কোথায় শুনি—তাঁর সামনেই নিবেদনটা জানাতে চাই।"

পরেশ বললে, "সে আজ শেষ-রাত্রের মেলে কলকাতায় গেছে। আটটায় মিটিং আছে, বারোটার মধ্যে এখানে ফিরে আসবে।"

কাল এই মিটিংটার কথা পরেশ, সোমেশকে জানিয়েছিল, একা সোমেশই অসম্মতি জানিয়েছিল—সে যেতে পারবে না। ইতিমধ্যে খুলনা-মেলে সেই শেষরাত্রে বরুণা যে কলকাতায় চ'লে যেতে পারে, আটটা হতে দশটা পর্য্যন্ত মিটিং সেরে, দশটা চল্লিশের ট্রেনে ফিরে আসতে পারে, এ তার কাছে বড়ো আশ্চর্য্যজনকই মনে হয়। ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বললে, "আজকের মিটিংটা স্থগিত রাখলে হতোনা পরেশদা? আমি এদিকে আজ একটা পাকা ব্যবস্থা ক'রে নেবো মাধববাবুর কাছ হতে, সেইজন্যে যেতে পারবো না জানিয়েছিলুম। যাক। সত্যবান আর মজিদ, তোমার এই দুটি অনুগত ভক্তও গেছে তো? ওখানে আজকের মিটিংটা কিসের, শুনতে পাই?"

পরেশ বলতে গেল, "মানুষকে মানুষের অধিকার লাভ করবার দাবি নিয়ে দাঁড়াবার। আজ এটা হচ্ছে, ঘরোয়া মিটিং। আগষ্টের অত্যাচার, আমাদের কি করা উচিত এখন, এইসব নিয়ে আলোচনা চলবে, তারপর হবে, বড়ো ক'রে একটা মিটিং ডাকা।"

সোমেশ মাথা নাড়ে—"কিন্তু, কিছুই হবেনা বোধহয়

পরেশদা। দিদিকে কেবল সাক্ষীগোপাল হয়ে কাগজপত্রে 'সাইন' করেই যেতে হবে। জানোনা, চারিদিকে বিশ্বাসঘাতক ঘুরছে! একজনকে হত্যা ক'রে অপরে তারই রক্তমাংসে শুধু তৃপ্ত হতে চায়না—বাঁচতে চায়। রেভোলিউশান এখন নয়, এখন হচ্ছে আগে খিদে মেটানো। বিপ্লবের বাণী এখন থাক, আগে শুধু খেতে দাও। যাক, আমি বাড়ী যাচ্ছি পরেশদা, তোমায় একটা কথা ব'লে যাই। মজিদ আর সত্যবানকে আমোল দিয়োনা। ওরা জেল হতে পালিয়ে এখানে কাজ করতে এসেছিল...যা-হোক কিছু সোরগোল বাধিয়ে ধরা পড়তে-পড়তে পালিয়েছে। তোমার নিজের এই অবস্থা, তোমায় ছাড়লেও, দিদিকে ওরা ছাড়বে না, কথাটা ব'লে দিয়ে যাচ্ছি।"

সে চ'লে গেল।

এসে পড়েছে, দারুণ দুর্ভিক্ষ। শ্রাবণ মাস চলছে, জলে ভ'রে গেছে সারা দেশ। কাছাকাছি কল-কারখানায় কাজ করতে চ'লে গেছে কত লোক—সেখানে কাজ না পেয়ে বহু লোক চ'লে গেছে, সহরে। ক্যান্টিনে যাহোক তারা খেতে পাবে তো! খ্যাদা-ডোম সেদিনে এসে পড়লো।

জাতিতে সে অস্পৃশ্য, গ্রামের একপ্রান্তে একখানা কুঁড়েঘরে সস্ত্রীক বাস করতো। প্রথম-স্ত্রী, মাস-আট আগে অনশনের প্রথমে মারা যাওয়ার পর খ্যাদা অকস্মাৎ বিবাগী হয়ে, ঘর ছেড়ে বার হয়ে পড়লো। তার কাজ ছিল, গ্রামের

নারকোল-গাছ কাটা, নারকোল পাড়া। কেবল এ-গ্রামে নয়, বহু দূর-দূর গ্রামেও সে কাজ করতে যেতো। এতে তার লাভ হতো বড়ো মন্দ নয়, যাতে ক'রে স্বচ্ছন্দে আজকালকার দিনে দুটি মানুষের দিন চলতো। তাছাড়া, খ্যাঁদা তার স্ত্রীকে সোনা-বাঁধানো চুড়ি আর গলায় সরু হারও দিয়েছিল।

সেই স্ত্রী মারা যেতে, খ্যাঁদা তার দড়ি-কাটারী ঘরে ফেলে, দরজায় চাবি দিয়ে, উন্মাদের মতন কোথায় যাত্রা করেছিল। তার পরিচিত খদ্দেরের দল অনেক বোঝালে, শেষপর্য্যন্ত প্রচার হয়ে গেল, নারকোল আর পাড়া হবেনা, খ্যাঁদা বিবাগী হয়ে গেছে!

সেই খ্যাঁদাকে দেখা গেল ঠিক একটি মাস পরে—একটি নববধূকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরেছে।

কুণ্ঠিত-হাসি হেসে সে বলেছিল, "কি আর করবো, গরীবের মেয়ে, তাতে নিজের জাত, ভেসে যাবে কোথায়, তাই বিয়েটা ক'রে-ফেলে, নিয়ে এলুম।"

লোকে খুশীই হলো। খ্যাঁদা চ'লে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার অভাবটা বৃহৎ হয়েই সকলের কাছে ঠেকেছিল—অগুণতি নারকোলের ব্যবস্থা কি হবে! তাছাড়া একঘর গৃহস্থ। গ্রামের লোক কাউকেই বিদায় দিতে চায়না।

খ্যাঁদার বয়েস যথেষ্ট হলেও, দ্বিতীয়-বিবাহের সঙ্গে-সঙ্গে তার নবযৌবন যেন আবার ফিরে এলো। প্রথম স্ত্রীর ভালো-ভালো কাপড়-জামা গহনাপত্র রাধাকে সে দিয়েছিল, তা

ছাড়াও গড়িয়ে দিলে, কানের পাশা, পায়ের আঙুলে ঝুমুর-দেওয়া চুটকি।

সেই খ্যাঁদা-ডোম এই শ্রাবণের মধ্যাহ্নে একদিন হঠাৎ কেঁদে এসে পড়লো, পরেশের কাছে। কান্না তার আর থামেনা, ছু'হাতে মুখ ঢেকে শুধু হুহু ক'রে কাঁদে।

পরেশ তখন রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা পড়ছে :

'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে,
'তিল ঠাঁই আর নাহিরে—
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভর ভর,
কালি মাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে।'

বইখানা বন্ধ ক'রে জিজ্ঞাসু-চোখে সে খ্যাঁদার পানে তাকায়—"কি হলো খ্যাঁদা ?"

খ্যাঁদা দারুণ বেদনায় কথা বলতে পারেনা, শুধু ফুলে-ফুলে কাঁদে।

বরুণা বললে, "বউয়ের সঙ্গে আজও কি ঝগড়া হয়েছে নাকি খ্যাঁদা ?"

"শুধু ঝগড়া ? বউ যে চ'লে গেছে মা—"

বরুণা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "চ'লে গেছে মানে ? কাল তো ঝগড়া বাধিয়েছিলে···মার-ধোর করেছো বুঝি ?"

খ্যাদা চোখ মোছে—"না মা, জাতে ডোম হই আর যাই হই, মেয়েছেলের গায়ে কোনোদিন হাত তুলেছি একথা আমার অতি বড়ো শত্রুও কোনোদিন বলতে পারবে না। আসল কথাটা হলো এই— ঘরে চাল নেই আজ অনেকদিন। কতদিন নারকোল গাছেও উঠতে পারিনি—আর যা দিনকাল পড়েছে, কেউ কোনো কাজ করাতেও চায়না। এই অবস্থায় মা, বউকে বললুম, তোমার চুড়ি-জোড়াটা দাও, এ'বছরটা খেয়ে বাঁচি, আসছে-বছর ধান-চাল হ'লে তোমায় চারগাছা খাঁটি সোনার চুড়ি গড়িয়ে দেবো। বলবো কি মা, যেই-না একথা শোনা, সঙ্গে-সঙ্গে সব গয়নাগুলো কোথায় যে লুকিয়ে ফেললে, কিছুই জানতে পারলুম না। তারপর, সেদিন হতে আমিও খোঁজে রইলুম, শেষ খুঁজে-খুঁজে চুড়ি-জোড়াটা কোনোরকমে হাত ক'রে, বিক্রি ক'রে, মাসখানেক চলার মত চাল এনে রেখেছি।"

বরুণা হাসি চেপে বললে, "ও, সেই চুড়ি নেওয়ার জন্যেই বুঝি ঝগড়া হয়েছে?"

মাথায় করাঘাত ক'রে খ্যাদা বললে, "শুধু ঝগড়া কি মা? চুড়ির জন্যে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে একেবারে নাস্তানাবুদ,—আঁচড়ে, কামড়ে, মেরে-ধ'রে, শেষটায় কিনা কাঁদতে-কাঁদতে কাপড়-চোপোড় নিয়ে একেবারে দে-চম্পট। বিশ্বাস নাহয়, এই দেখ মা।"

বরুণা তাকিয়ে দেখলে, সত্যিই সমস্ত মুখ, বুক আর পেটে তার নিদারুণ আঁচড়ানোর চিহ্ন।

পরেশ মৃদুকণ্ঠে বললে, "নখী, দন্তী এবং শৃঙ্গী, মানুষের মাঝে একাধারে সবগুলিই মিলে যাচ্ছে দেখছি।"

বরুণা গম্ভীরভাবে বললে, "নখী, দন্তী বটে, কিন্তু শৃঙ্গী কথাটা অতিশয়োক্তি হয়ে গেল।"

খ্যাঁদা ততক্ষণ কেবল চোখ মোছে। প্রথমপক্ষের স্ত্রী মানুষ-হিসেবে ভালো হলেও, খ্যাঁদা তাকে ঠিক মিলিয়ে নিতে পারেনি। তাকে কতকটা সমীহ ক'রে চলতে হতো, ভয়ও করতে হতো। কবে সে এসেছিল তা তার মনে পড়েনা, তবে শুনেছে, খ্যাঁদার মা তার তেরোবছর বয়েসে, আটবছরের মেয়ে বসুকে কুড়ি টাকার বিনিময়ে নিয়ে এসেছিল। তাকে ভালোবাসা দিয়েছিল, কিন্তু সে-ভালোবাসা যে, ভালো-লাগার খাতিরে, তা খ্যাঁদার অশিক্ষিত মনও স্বীকার করবে না। বসু মারা গেলে খ্যাঁদা অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিল সেটা শুধু নিজের কষ্টের জন্যে। তাছাড়া একটা লোক, দিনরাত যে তারই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সর্বদা ব্যস্ত থাকতো, তার অভাবটা বেশী ক'রে লাগবারই কথা বটে। কিন্তু, রাধা? তার সঙ্গে, বসুর কথা আলাদা। একে ভালো লেগেছিল, এবং খ্যাঁদা সেইজন্যে রাধার উৎপীড়নও হাসিমুখে সয়ে গেছে।

আজও সব সয়ে যেতো—যদি রাধা না চ'লে যেতো।

খ্যাঁদা মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো অধৈর্য্যভাবে টানে··· ব্যাকুল-কণ্ঠে বলে, "এখন কি করবো বাবু? ও যে চ'লে গেল কলে কাজ করতে—আমি কি ক'রে ওকে ফেরাবো?

পরেশ বললে, "কলে গেল কার সঙ্গে ?"

খ্যাঁদা আবার কপালে করাঘাত করে—"ওই যে বাবু। ওই হারাধনের জামাই সেই বাউণ্ডুলে দুলাল-মিস্ত্রীটার ঘরে গিয়ে উঠেছে গো। আমি আজ সকালেই খোঁজ করতে গিয়েছিলুম— দেখলুম, দুলাল-মিস্ত্রীর ঘরে গিন্নী হয়ে রান্নাবান্না করছে।"

পরেশের মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে—

"কিন্তু, আমার অবস্থা তো দেখছো খ্যাঁদা, নিজের নড়বার ক্ষমতা নেই। তুমি বরং, সোমেশের কাছে যাও। সে ওদিকে যাওয়া-আসা করে, যাহোক একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।"

বরুণা বললে, "তাই করো খ্যাঁদা। সোমেশের কাছে গিয়ে এইসব কথা বলো, সে তোমার বউকে ফিরিয়ে এনে দেবে-এখন।"

সন্দিগ্ধভাবে খ্যাঁদা বললে, "কিন্তু, সে-বাবু—করবে তো? যা রগ্‌চটা বাবু, কথা বলতে ভয় করে।"

বরুণা স্নিগ্ধহাসি হাসে, বলে, "না-না, ভয় কিসের? তুমি এখানে যেমন ক'রে কেঁদে পড়েছো, তেমনি ক'রে কেঁদে পড়ে গিয়ে—দেখো, উপায় একটা হবেই।"

খ্যাঁদা উঠলো বটে, কিন্তু ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারলে না।

পরেশ একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "এইরকম মন্বন্তরে, কতো লোক শুধু মরেই যায়না বরুণা, কতো হারিয়েও যায়। পেটের জ্বালা, বড়ো জ্বালা। সন্তান-শোক পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। খেতে না পেয়ে, বড়ো দুঃখেই যে মেয়ে ঘর ছেড়ে চ'লে গেল, আমার মনে হয়, তাকে ফেরাতে পারবে না খ্যাঁদা, ব্যর্থ হবে।"

তেরো

বস্তীর একখানা ঘরে থাকে, দুলাল মিস্ত্রী। এইখানেই উঠেছে গিয়ে রাধা।

খ্যাঁদার কুটীরে কচি-ডাবের সন্ধানে দুলাল প্রায়ই যাওয়া-আসা করতো। রোজ তার টাটকা ডাব খাওয়া কবিরাজ ব্যবস্থা করেছিল। অসুখ তার মনে কি দেহে, অশিক্ষিত খ্যাঁদা তা কোনোদিনই সন্দেহ করেনি।

শ্রাবণের ধারায় নারকোল গাছ হয়েছে দারুণ পেছল, তবু নগদ পয়সার লোভে কোনোরকমে দড়ি কোমরে বেঁধে, পেছল-গাছে পা বাধিয়ে খ্যাঁদা গাছে উঠতো—ডাব পাড়তো।

এক-একটা ডাব, দুলাল কিনতোও মোটা দামে চারআনা, আটআনা—যে দাম কেউ দেয়না। এই মন্বন্তরের সময় লোকে খেতে পায়না, এইসময়ে দুলাল মিস্ত্রী পয়সা ছড়িয়েছে নেহাৎ কম নয়। কলের পয়সা হুহু ক'রে যেমন হাতে আসে, হুহু ক'রে তেমনি বেরিয়েও যায়।

রাধা নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে দু'পয়সা সঞ্চয় করেছে স্বামীকে লুকিয়ে। প্রতি ডাবের দাম, চার-ছ'পয়সা হিসেবে খ্যাঁদার হাতে দিয়ে, বাকি সে লুকিয়ে রাখে—কে জানে, এরপর কাজে লাগতে পারে।

আকাল···দারুণ আকাল···

চিরন্তনী

চারিদিকে হাহাকার! কতো লোক না খেতে পেয়ে মরছে, কতো লোক গ্রাম ছেড়ে বার হয়ে যাচ্ছে...

চাল পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু, টাকা কই? কোনোদিন একবেলা, কোনোদিন উপবাস দিয়ে শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে।

সনাতন, টাকা পেলে চাল দিতে পারে। জমিদার মাধব দাসের গোমস্তা সে, কিছু চাল কোন্ ফাঁকে সরিয়ে ফেলেছে, পঞ্চাশটাকা মণ হিসেবে ছাড়তে পারে—চুপি-চুপি কথাটা প্রচার হয়ে গেছে।

খ্যাঁদা, রাধার কাছে বাঁধানো-চুড়ি দুটো ধার চেয়েছিল, বিক্রি ক'রে কিছু চাল সংগ্রহ করবে।

রাধা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। না খেয়ে মরা বরং ভালো, তবু, গয়না সে কিছুতেই দিতে পারেনা। করুণ-কণ্ঠে সে শোনালে—'দিয়ে নিলে, কালীঘাটের কুকুর হয়।' রাধা, খ্যাঁদাকে এ মহাপাতক হতে বাঁচাতে চায়।

সেই চুড়ি গেল, চুরি।

ঘরে এলো চাল, কিন্তু রাধা উঠলো না, রাঁধলে না। খ্যাঁদা ভাত রেঁধে সামনে ধরলেও সে তাকিয়ে দেখলে না।

দুলাল মিস্ত্রী পয়সা ছড়িয়েছে—রাধা সোজা গিয়ে উঠেছে তার ঘরে। নিজের যা-কিছু ছিল সব নিয়ে গেছে।

বারান্দায় ব'সে চোখের জল মুছতে-মুছতে রাধা বলে—"এই মা কালীর নামে দিব্যি গালছি মিস্ত্রী, আর যদি ও-মিনসের

ঘরে যাই তো আমার নাম রাধা-ডোমনীই নয়। উঃ, কি কাণ্ডটা করলে? চুড়ি-জোড়াটা—দিয়ে নিলে? ইচ্ছে ক'রে আরজন্মে কালীঘাটের কুকুর হবে গো। অমন চুড়ি-জোড়াটা ক্ষয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি হাতে দিতুম না গো। সেই চুড়ি-জোড়াটা বিক্রি ক'রে মিনসে কিনা, চাল নিয়ে এলো? অ্যাঁ। আমি যাবো কোথায় গো?"

দুলাল সান্ত্বনা দেয়, "তার জন্যে আর কেঁদে কি করবি বল্, যা গেছে তা আর হবেনা। আর, ওই দুখ্যু-কষ্টের মধ্যে থেকে কোন্‌দিন খেতে পাস, কতদিন শুকিয়ে থাকিস, কি দরকার বল দেখি? তোর আর কি। পাঁচটা ছেলেপুলে নেই যে, তাদের জন্যে ওর ঘরে প'ড়ে থাকবি। একলা মানুষ, যেখানে থাকবি কাজ করবি, খাবি-পরবি—ফুর্ত্তি করবি। ওই একটা ছোটলোক খ্যাদা—যার কাজ শুধু নারকোল পাড়া, তার ঘরে কি তোকে মানায়? তাছাড়া, নিশ্চয়ই তোকে মার-ধোরও করতো—ছোটলোক তো! স্বভাব যাবে কোথায়?"

রাধা সলজ্জে মুখ ফেরায়—"না। ও-মিথ্যেকথাটা বলবো না মিস্ত্রী। মিনসে আর যাই হোক, খেতে-পরতে দিতে না পারুক, চুড়ি নাহয় চুরি করেইছে, সে-ও নিজেদেরই পেটের জ্বালায়—তবু গায়ে কোনোদিন হাত দেয়নি। ও-অপবাদ তার নামে আমি দিতে পারবো না মিস্ত্রী, তাহ'লে নরকেও আমার ঠাঁই হবেনা।"

দুলাল খুশী হতে পারলে না, মুখখানা বিকৃত ক'রে সে একটা বিঁড়ি ধরালে।

"যাক্, এখানেই থাক্, কাল একটা কাজ যোগাড় ক'রে দেওয়া যাবে বাবুদের ব'লে। তোর ভাবনাই-বা কি, আর দুঃখ্যই-বা কিসের? তোর অন্ন খাবে কে? দুদিন না যেতে দেখবি, ওই খ্যাঁদা-ডোম তোর দরজায় এসে ধন্না দেবে।"

ঠোঁট উল্টে রাধা বলে, "আসবে কোন্ লজ্জায়, শুনি? যে লোক পরিবারকে গয়না দিয়ে, সেই গয়না চুরি ক'রে বিক্রি করে, তার আবার মুখদর্শন করবো আমি? অত সোজা লোক আমায় পাওনি মিস্ত্রী! আমিও ব'লে রাখছি, মিনসে এলে আমি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো তবে আমার নাম—রাধা।"

এবার, ভারি খুশী হয় দুলাল মিস্ত্রী।

"হ্যাঁ। এবার একটা কথার মতন কথা বলেছিস রাধা। আমি না থাকতেও যদি সে আসে, ওইখান হতে বিদায় করবি। দেখা করিস নি, বরং চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করবি।"

রাধা হেসে বলে, "সে আর বলতে হবেনা মিস্ত্রী। আমি চেঁচিয়ে সাত-গাঁয়ের লোক এক করবো, বলবো, ও আমার কেউ নয়, আমায় বেইজ্জত করতে এসেছে। সে-সব ফন্দী-ফিকির আমি বেশ জানি, আমায় আর শেখাতে হবেনা।"

কিন্তু দুলাল ঠিক তাকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। রাধার মুখে যেন অবিশ্বাসের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। দুলালের সঙ্গে অনেকদিন হতে তার পরিচয়, তবু তাকে হাতের মধ্যে পাওয়া যায়না। তাকে হস্তগত করার জন্যেই দুলাল এ-পর্য্যন্ত অনেক খরচ করেছে, তার হাত হতে টাকাটা-

:সিকেটা অনেক পেয়েছে রাধা,—তবু রাধার ওপর তার কোনো দাবি আজও হয়নি। রাধা, খ্যাঁদার সঙ্গে বিবাদ ক'রে তার আশ্রয়ে এসেছে—বার-বার দিব্যি করছে সে আর কিছুতেই খ্যাঁদার কাছে যাবেনা—তবুও তাকে সব দিক দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত সুরক্ষিত করতে দেখে, দুলালের মনে সন্দেহ জাগে—ওই খ্যাঁদা-ডোমের নামে সে যত-যাই বলুক, মন তার কিন্তু খ্যাঁদাকেই চেয়ে ফিরছে।

দুলালের স্পর্শ-দোষ নেই—রান্নাবান্নার ভার অনায়াসে অসঙ্কোচে সে রাধার হাতে ছেড়ে দিয়েছে।

রাধা প্রথমটায় ইতস্তত করেছিল—"কি যে বলো মিস্ত্রী, আমার হাতে ভাত-তরকারি খাবে তুমি—এও কি হতে পারে? আমি ডোমের মেয়ে—ডোমের বউ, আমি রাঁধবো ভাত-তরকারি আর তুমি ভালো-জাতের ছেলে—তুমি সেটা খাবে? তোমার জাত যাবে, আর আমি নরকে পচে মরবো যে!"

"হো-হো-হো-হো-হো-হো-হো…"

দুলাল মিস্ত্রীর হাসি আর থামেনা।

"হায়-হায় রে! শেষকালে, জাত নিয়ে মরছিস রাধা? অজাত-কুজাত আর কি ভুভারতে আছে রে। এই দেখনা—সব একাকার হয়ে যাবে দুদিনের মধ্যে। দেখবি, তখন বামুনের ছেলেই তোর মতন ডোমের মেয়ে বিয়ে করে আসবে। এই যে আমরা কলে কাজ করছি, এ তো ছত্রিশ-জাতের কল। কেউ এর মধ্যে জাত বাঁচিয়ে চলতে পেরেছে কখনো? গরীবের আবার জাত, গরীবের

আবার ধর্ম্ম। ওসব শিকেয় তুলে রাখ্ রাধা—শিকেয় তুলে রাখ্। জাত তোলা থাক, বড়লোকের জন্যে। আমাদের জন্যে জাত নয়। তুই রাঁধ দেখি। দেখ্, আমি-মানুষটা সে ভাত খেয়ে বদলাবো না। তোর কিসের পাপ রে। তোকে আমি আমার জাতে তুলে নিচ্ছি—বুঝবি এর পরে।”

রাধা কেমন যেন সন্দিগ্ধ-চোখে তার পানে তাকায়। মিস্ত্রীকে আগে যে সরলমনে বিশ্বাস ক'রে এসেছে, সে-বিশ্বাসে হঠাৎ যেন ফাটল ধরে।

অনেকখানি এগিয়েও দুলাল একটু তফাতে থাকে। রাত্রে সে বারান্দায় থাকে, রাধা ভেতর হতে দরজা দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে ঘরের মধ্যে ঘুমোয়।

অনেকদিন পরে রাধার হাতের রান্না খেয়ে দুলাল পরম পরিতৃপ্ত হয়।

সেদিন ছিল, রবিবার। ছুটির দিন।

বাইরে বেড়িয়ে দুলাল ঘরে ফিরলো প্রায় দেড়টার সময়। রাধা রান্না শেষ ক'রে বসেছিল।

স্নান সেরে দুলাল খেতে বসে—রাধা পরিবেশন করে।

ঠিক সেইসময়ে ভেজানো-দরজা ঠেলে, দুলালের ছেলে বাদলার হাত ধ'রে এসে পড়লো, দুলালের শ্বশুর—হারাধন।

দুলাল তখন মাছের মুড়ো খেতে-খেতে সবেমাত্র মজার গল্প সুরু করেছে, অকস্মাৎ শ্বশুর এবং ছেলেকে সশরীরে উপস্থিত হতে দেখে তার গলায় যেন মাছের মুড়ো বেধে গেল।

হারাধন কথাটা শুনে বিশ্বাস করতে পারেনি তাই স্বচক্ষে দেখতে এসেছে।

মুহূর্তমাত্র আড়ষ্টভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপরই তার-স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—"অ্যাঁ! লোকে তাহ'লে কথাটা মিথ্যে বলেনি। তোর শেষটায় এই অধোগতি হলো? আমার মেয়েটাকে, নিজের ছেলে-মেয়েদের, সত্যি জলে ভাসিয়ে দিলি হতভাগা! পরের বউ, তার ওপর জাতে ডোম, তাকে নিয়ে এসে শেষকালে ঘর বাঁধলি? এর চেয়ে তোর যে মরে যাওয়াই ভালো ছিল রে নচ্ছার!"

রাগে সে আর কথা বলতে পারেনা।

দুলাল ততক্ষণে কেশে, হেঁচে, টালটা সামলে নিয়েছে। এবার সটান সে উঠে দাঁড়ালো, রক্তবর্ণ-মুখে বললে, "বেশ করেছি। আমার যা খুশি আমি তাই করবো। তুমি বাড়ী ব[illegible] গালাগালি করতে এসো কোন্ অধিকারে, শুনি? যাও, আমি তোমায় চিনিনা। বেরিয়ে যাও বলছি।"

বৃদ্ধ হারাধন যেন আকাশ হতে পড়ে—"কোন অধিকারে কি রে হতভাগা। আমার অধিকার নেই তোর ওপর? ওরে নেমকহারাম কোথাকার! আজ একথা বলবার সাহস হলো তোর? বাড়ীতে যে খেতে পাচ্ছিলি না, এখানে এনে খাইয়ে-দাইয়ে তোয়াজ ক'রে, বাবুদের ধ'রে কাজে দিয়েছি—আজ হারামজাদা বলে কিনা, আমায় চেনেনা? বলে কিনা, আমি কে? আমার কি অধিকার আছে? বলি, তোর নিজের

ছেলেকেও তুই চিনতে পারলিনি, পাজী? ছেলেটাকেও দূরদূর ক'রে খেদিয়ে দিলি? এ তোর ধর্ম্মে সইবে?"

মুখ বিকৃত ক'রে ছলাল বলে, "ওরে আমার ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! উনি আমায় ধর্ম্মের উপদেশ দিতে এসেছেন। যাও-যাও! এ বেনাবনে আর মুক্তো ছড়িয়ো না। তোমার ওই নাতিকে তুমি যতো পারো উপদেশ দিয়ে মানুষ করো গিয়ে, আমায় রেহাই দাও।"

এরপর হারাধন কি বলবে ঠিক করতে পারেনা। যে লোক সব-কিছু অস্বীকার ক'রে উড়িয়ে দেয়—তার কাছে আর দাবির কান্না কাঁদা চলেনা।

জামাইয়ের দিক হতে চোখ ফিরিয়ে সে রাধার ওপর রাখে, ঘৃণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে।

অস্পৃশ্যা ডোমের ঘরের মেয়ে, যার ছায়া মাড়ালে নাইতে হয়, সেই কিনা রান্নার ভার নিয়েছে, আর তার হাতের রান্না ভাত-তরকারি মাছের মুড়ো খাচ্ছে তারই জামাই, জাত-কৈবর্ত্তের ছেলে—ছলাল?

কালে-কালে এসব হলো কি? জাতজন্ম কিছু রইলো না—ছি—ছি—ছি।

নিঃশব্দে হারাধন নাতির হাত ধ'রে বাইরে আসে—মনের ঘৃণায় আর একটি কথা বলার প্রবৃত্তি তার হয়না।

চৌদ্দ

দুলাল, হপ্তা-কাবারী টাকা হাতে পেয়েই একখানা শাড়ি কিনে ফেলে, সঙ্গে-সঙ্গে আলতা, টিপ, রঙিন কাঁচের চুড়ি···

হাতে ক'রে নিলে বটে রাধা, কিন্তু মুখ তার প্রফুল্ল হয়নি। বরং, মনে হলো—অন্ধকার হয়ে উঠলো। তবু সে হাতে ক'রে নিলে—যেন শুধু কৃতজ্ঞতার খাতিরেই।

দুলাল চায়—রাধা শাড়ি প'রে, কপালে টিপ, হাতে চুড়ি প'রে, পায়ে রঙিন আলতা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু শাড়ি-চুড়ি-টিপ-আলতা দেয়ালের থাকে পড়েই রইলো কদিন, রাধার অঙ্গে আর উঠলো না।

আমতা-আমতা ক'রে দুলাল বলে, "কই, ওগুলো পরলে না রাধা? তোমার জন্যেই যে আনলুম!"

অত্যন্ত শীতলকণ্ঠে রাধা বললে, "ও, আমার জন্যে? আচ্ছা, থাক্। যেদিন দরকার হবে সেদিন পরবো।"

সেইদিনই রাত্রে দুলাল যখন তাস খেলে ফিরে খেতে বসলো তখন রাধা সুধোলে, "কই মিস্ত্রী, আমার কাজের ঠিক ক'রে দেওয়ার কথা ছিল যে এই হপ্তায়, তার কি হলো? কতদিন আমি এমনি ক'রে তোমার অন্ন ধ্বংস করবো বলো তো?"

"অন্ন ধ্বংস?"

দুলাল, টেনে-টেনে হাসে।

"কি যে যা-তা বলিস রাধা, অন্নধ্বংস আবার কি? বলি, তুই তো ব'সে-ব'সে ভাত খাচ্ছিস নি, রীতিমত খেটে তবে দু'বেলা দু'টো ভাত খাচ্ছিস। এতে তোর লজ্জা পাওয়ার কারণটা কি হলো?"

অবুঝ রাধা বোঝেনা—বলে, "না মিস্ত্রী। আমি ঠিক এমনি ভাবে থাকতে পারবো না। যাই হোক আমায় একটা কাজ তুমি ঠিক ক'রে দাও—তাতে যা পাই আমার তাই ভালো।"

দুলাল বললে, "আমি কি সে-চেষ্টা না ক'রে, চুপ ক'রে আছি? কলে সামনের মাসে লোক নেওয়া হবে—সেইসময় তোর কাজও হবে বড়োবাবু ব'লে দিয়েছেন। এই ক'টা দিন নাহয় নিশ্চিন্ত হয়ে আমায় দুবেলা ভাত রেঁধে খাওয়ালি, তাতে তো মহাভারত অশুদ্ধ হবেনা!"

তারপরেই একটু হেসে বললে, "আর, সত্যি যদি আমার ঘরে থেকে আমার ভাত রাঁধতে তোর মন না হয়, তুই ফিরে যেতে পারিস খ্যাঁদার ঘরে। সে তো সকলের কাছে যা-না তাই ব'লে বেড়াচ্ছে—তুই নাকি তার সর্ব্বস্ব নিয়ে চ'লে এসেছিস, একবার তোকে হাতে পেলে সে দেখে নেবে তোকে—"

বলতে-বলতে সে সকৌতুকে রাধার পানে তাকায়।

রাধার ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে ওঠে, বিকৃতকণ্ঠে সে বলে, "দেখে নেবে? আমিও তাকে দেখে নেবো মিস্ত্রী, যদি সে কোনোদিন এখানে আসে। হাতের কাছে ঝাঁটা রেখেছি,

ঝেঁটিয়ে তার বিষ ঝেড়ে দেবো। বদনাম দেওয়া যে কেমন, সোজা তা বুঝিয়ে দেবো।"

রাগে সে ফুলতে থাকে।

দুলাল নিশ্চিন্ত হয়।

রাধাকে এখনো সে বিশ্বাস করতে পারেনা। তার মনে হয়, রাধা মনে-মনে আজও সেই খ্যাদা-ডোমকেই ভালোবাসে। সে যখন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে তখন মনে হয়, সে বুঝি খ্যাদাকেই ভাবছে। সাহস ক'রে দুলাল, রাধার দিকে এগুতে পারে না—কি জানি শেষে যদি তার গালেই চড়টা এসে পড়ে!

সম্প্রতি দেখা হয়েছে, সোমেশের সঙ্গে।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে বলেছে, "তোমার কি আক্কেল বলো তো দুলাল? নিজের পরিবার ছেলে-মেয়ে সব থাকতে, তাদের সব ভাসিয়ে দিয়ে, তুমি কি-না একজনের বিয়ে-করা বউকে ফুসলে নিয়ে গেছ? ধরলুম, জাত-বিচার নাহয় নাই করলে। কিন্তু, এটা তো জানো, সে একজনের স্ত্রী? তার স্বামী যদি নালিস ঠুকে দেয়, তোমায় যে জেলে পচে মরতে হবে। এখনো যদি ভালো চাও, খ্যাদার বউ—খ্যাদাকে ফিরিয়ে দাও, তাতে নালিস আর হবেনা—তুমিও বাঁচবে।"

কথাটা শুনে দুলাল সত্যিই ভাবনায় প'ড়ে গেছে। এর মধ্যে চুপি-চুপি কাছাকাছি-সহরে গিয়ে উকিলকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছে—এতে সত্যিই তার জেল হতে পারে। তবে,

একমাত্র ভরসা এখন খ্যাঁদার বউ। সে যদি বলে, সে নাবালিকা নয় এবং স্বামীর অত্যাচারে ঘর ছেড়ে চ'লে এসেছে।

নাবালিকা যে নয়, তা রাধা স্বীকার করে। আঙুল গুণে হিসেব ক'রে বলে, তার বয়েস কুড়িবছর পার হয়েছে এই আষাঢ় মাসে। কিন্তু ওই-কথাটা সে কিছুতে মানতে চায়না। খ্যাঁদা যে অত্যাচার করেছে, তাকে মারধোর করেছে—একথা সে কিছুতেই বলতে চায়না।

চুরির কথা সে মানে, তবু তার একটা হেতু রাখে—"কি করবে সে মিস্ত্রী, আমি তারই-দেওয়া সোনার গয়না লুকিয়ে রেখেছি, অথচ, সে-মানুষটা তিনদিন ভাত না খেয়ে আমারই খাওয়ার জন্যে চাল খুঁজে বেড়িয়েছে। যাক, যাঁর জিনিস সেই নিয়েছে, তাই ব'লে আমি চুরির ফ্যাসাদে তাকে জড়াবো না।"

ছুলাল রাগ করে, বিরক্ত হয়ে স'রে যায়, খ্যাঁদাকে জব্দ করার চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে যায়—তবু 'রাধাকে সে ছাড়তে পারেনা।

রাধা প্রায় ঘরের বার হয়না। ভোরে সে জল তুলে এনে রাখে কল হতে, আবার বার হয়—সন্ধ্যায়।

সেদিন ছুপুরে কলসা ও বালতি নিয়ে বার হয়ে পথে পা দিতেই দেখা হলো, সোমেশের সঙ্গে। ছোটবাবুকে সে চেনে—কতদিন ডাব বয়ে ছোটবাবুর পিসীমাকে দিয়ে এসেছে।

আজ এমন সময় যে সোমেশকে দেখতে পাবে তা রাধা স্বপ্নেও ভাবেনি। তাড়াতাড়ি কলসী-বালতি নামিয়ে, কোমরে

জড়ানো আঁচল খুলে সে মাথায় ঘোমটা টানলে, তারপর সেই পথের ওপরেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে।

দুষ্ট-প্রকৃতির এই মেয়েটার সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তি সোমেশের ছিলনা। বেচারা খ্যাঁদার জন্যে সে সত্যিই বড়ো দুঃখ পেয়েছিল···দুর্ব্বৃত্তা নারীজাতির ওপর তার কেমন যেন একটা বিদ্বেষ চেপে গিয়েছিল। রাধার দিকে না চেয়ে সে পাশ কাটিয়ে হনহন্ ক'রে চ'লে যাচ্ছিলো, কিন্তু রাধার করুণ কান্নাভরা কণ্ঠস্বরটা তাকে বাধা দিলে।

"যাবেন না দাদাবাবু, দয়া ক'রে এসেছেন যদি, আমার একটা কথা শুনে যান।"

সোমেশ আর পা বাড়াতে পারলে না—দাঁড়ালো। তারপর দু'পা স'রে এসে রুক্ষকণ্ঠে বললে, "বলো, কি কথা বলতে চাও।"

"দাদাবাবু গো···"

বলতে-বলতে রাধা একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার অভাগিনীর মতন কান্না দেখে সোমেশ কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। যে মেয়ে স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর ছেড়ে, নিজের সব-কিছু গুছিয়ে নিয়ে, সদর্পে স্বামীর সুমুখ দিয়ে হেঁটে এসে পরের ঘরে ঘর করছে, সে হঠাৎ এমনভাবে কাঁদে কেন?

পরমুহূর্ত্তেই সে শক্ত হয়ে ওঠে। না, এরকম কান্নায় সে ভুলবে না। সে কঠোরকণ্ঠে বললে, "শুনছি, খ্যাঁদার নামে চুরির অপবাদ দিয়ে তাকে জেল-খাটানোর মতলব হচ্ছে, আবার এ-রকম ন্যাকামোর কান্নার দরকার? বলি, একটা কথা জিজ্ঞেস

করি খ্যাঁদার বউ, কোন দুঃখে তুমি সে-লোকটাকে ফেলে চ'লে এলে? তোমার মনেও কি একটু বাজলো না—অ্যাঁ? তোমরা বাপু সব পারো। তাতেও খুশী না হয়ে এখন আবার লোকটাকে জেল খাটানোর মতলব করছো? কিন্তু একথা জেনো বাপু, আমরা যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ তুমি ওকে চুরির দায়ে জেল খাটাতে কিছুতেই পারবে না। যত টাকা খরচ লাগে লাগবে, আমরা ওকে বাঁচাবো আর ওই দুলালটাকে জেলে পাঠাবো—এই আমার পণ।"

তার কথা শুনতে-শুনতে রাধার চোখের জল শুকিয়ে যায়, সে একবারে শুকিয়ে ওঠে···

"তুমি বলছো কি গো দাদাবাবু? ওর নামে চুরির নালিশ আনলে কে—আমি তো কিছু জানিনা?"

"না, তুমি কিচ্ছু জানোনা। বদ মেয়েছেলে কোথাকার।"

সবেগে সোমেশ চলতে গিয়ে আবার বাধা পায়। রাধা একেবারে তার পায়ের তলায় আছড়ে প'ড়ে, দু'হাতে তার পা দু'খানা জড়িয়ে ধ'রে পায়ের সামনে ঢিপ্‌ঢিপ্ ক'রে মাথা খুঁড়তে-খুঁড়তে বললে, "আমি কিচ্ছু জানিনা। দাদাবাবু গো, ওই মিস্ত্রী তলে-তলে সড় ক'রে এইসব কাণ্ড করছে গো! আমায় একটা কথা ব'লে যাও দাদাবাবু, মিনসে কেমন আছে। খেতে পাচ্ছে তো? খাচ্ছে কোথায়?"

সোমেশ রাগ ক'রে বললে, "কেমন আবার থাকবে। নিত্যি জ্বর আসছে, প'ড়ে আছে বিছানায়। দেখবে কে? আমার

তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তাই খ্যাঁদা-ডোমের বাড়ী গিয়ে তার সেবা-শুশ্রূষা করবো। এরপর পুলিস যাবে, ওর ওপর যখন মারতে সুরু করবে, তখন এক-ঘায়েই শেষ হয়ে যাবে। মরুক—মরলে তোমারই তো ভালো খ্যাঁদার বউ…”

রাধার হাত দু’খানা কখন শিথিল হয়ে খ’সে পড়ে। আস্তে-আস্তে সে উঠে বসে।

সোমেশ কখন চ’লে যায় তা সে জানতেও পারেনা।

মাথাটা তার ঘুরছে…চোখে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছেনা। টলতে-টলতে কলস-বালতি নিয়ে, বস্তীর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক’রে দিয়ে সে আছড়ে পড়ে।

পাঁচটায় কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, শ্রমিকেরা ঘরে ফিরে আসে।

দুলালও ফিরলো।

মাটিতে প’ড়ে আছে রাধা। কেঁদে-কেঁদে তার সমস্ত মুখখানা ফুলে উঠেছে।

দুলাল অবাক হয়ে যায়—ব্যাপার কি? রাধার আজ এ-ভাব কেন?

দু’চারবার সে রাধাকে ডাকলে, উত্তর না পেয়ে নিজেই ষ্টোভ ধরিয়ে চা করলে, তারপর নিজে খেয়ে, রাধার চা নিয়ে দিলে তার কাছে।

“ওঠ, উঠে আগে চা খেয়ে নে রাধা। কি হয়েছে তারপর শুনব-এখন। ঠিক বুঝেছি, সেই খ্যাঁদাটাই এসেছিল, কত কি বলেও গেছে নিশ্চয়।”

রাধা উঠে বসে—

এলো চুলগুলো দু'হাতে জড়িয়ে বেঁধে, মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে শান্তকণ্ঠে বলে, "আমি তোমার জন্যেই এখনো ঘরে আছি মিস্ত্রী। তোমার জিনিসপত্তর তুমি বাপু সব বুঝে-সুঝে নাও, আমি আমার যা-কিছু আছে নিয়ে চ'লে যাচ্ছি।"

"চ'লে যাচ্ছিস ?"

দুলাল যেন আকাশ হতে পড়ে।

"কোথায় যাচ্ছিস ? কেন যাচ্ছিস ? কেউ কিছু বলেছে ?"

রাধা মাথা নাড়ে—না। কারও কিছু বলবার ধার রাধা-ডোমনী ধারেনা। নিজে এসেছিলুম···তোমার ঘরে কাজ করেছি, খেয়েছি···আজ নিজেই চ'লে যাচ্ছি। তোমার দেওয়া কাপড়-চুড়ি-টিপ-আলতা ওই থাকেই রইলো মিস্ত্রী—যাকে খুশি হয় দিয়ো। আমি গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছি।"

"গাঁয়ে মানে, খ্যাদার কাছে ?"

চোখের জল ফেলতে-ফেলতে রাধা বলে, "হ্যাঁগো হ্যাঁ মিস্ত্রী, তারই কাছে। মিনসের নাকি বড্ডো অসুখ, দেখতে কেউ নেই। গেলে তো আমারই যাবে···আর তো কারও যাবেনা···তাই খবর পেয়েই আমি ছুটছি। যাকগে নিয়ে আমার সোনা-বাঁধানো চুড়ি, এ কাল-মন্বন্তর কেটে গেলে মিনসে খাঁটি-সোনার চুড়ি গড়িয়ে দেবে বলেছে। আর যদি নাই দেয়, নাইবা দিলে চুড়ি—চুড়ি প'রে তো আমার সব হবে। আমি তো সব-কিছুই নিয়ে এসেছি। এখনো আমার হার, পাশা, নগদ পঞ্চাশ-ষাট

টাকা আছে, এত থাকতে মিনসের চিকিৎসা হবেনা—পথ্যি পাবেনা এ কখনো হতে পারে গো মিস্ত্রী? না বাপু, আমি চললুম। তোমার জিনিসপত্র সব দেখেশুনে নাও।”

কাপড়-জামা যা-কিছু সে এনেছিল, পুঁটুলী বেঁধে কাঁখে ক’রে নিয়ে ছুলালের সামনে দিয়ে বার হয়ে গেল।

বজ্রাহতপ্রায় ছুলাল ব’সে রইলো, একটি কথাও সে বলতে পারলে না—একটা নিষেধের বাণী পর্য্যন্ত তার মুখে বার হলোনা।

ছোটবেলায়-শোনা একটা ছড়া মনে পড়ছিল:

‘আমে-ছুধে এক হলো
আঁটি আঁস্তাকুড়ে গেল।’

পনেরো

সেদিনকার ডাকে-আসা পত্রখানা পরেশ পড়ছিল, এমন সময় সোমেশ এসে তার পাশে ব’সে পড়লো।

সচকিতভাবে পরেশ স’রে বসলো, তিরস্কারের সুরে বললে, বারবার বলি, অত কাছে এসোনা খানিকটা তফাতে থাকো··· কিছুতেই যদি আমার কথা কানে নাও সোমেশ। আজ সামনা-সামনি আমি খুব ভালো থাকলেও, আমার মধ্যে যে বীজাণু আছে তা যে তোমাদেরও এক নিমেষে আটক করতে পারে, সে-কথাটা মনে রেখো।”

সোমেশ সরলো না। সেইখানেই শুয়ে প'ড়ে চীৎকার ক'রে ডাকলে, "এক গ্লাস জল চাই দিদি, ভীষণ পিপাসা। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এই সময়টায় যদি জল খাওয়াতে পারো তো, স্বশরীরে স্বর্গে চ'লে যাবে ব'লে রাখছি।

"স্বশরীরে স্বর্গে যাওয়াটা আমার শিকেয় তোলা থাক ভাই। স্বর্গে আমার কেউ নেই, তাই ওই মুনিবাঞ্ছিত স্থানটা আমার কাম্যও নয়। আমার মাটির পৃথিবীই ভালো ভাই, সেখানে সবার দেখা মেলে।"

বলতে-বলতে হাসিমুখে বরুণা একগ্লাস জল এনে দিলে।

একনিশ্বাসে জলটা পান ক'রে গ্লাস ফিরিয়ে দিয়ে সোমেশ বললে, "আমার অবস্থা হয়েছে সেই এনসেণ্ট ম্যারিনারের মত। 'জল—জল, চারিদিকে জল, চারিদিকে থইথই করছে জল, কিন্তু পান করবার মত, তৃষ্ণা মেটাবার মত একফোঁটা জল পেলুম না।' এই বর্ষায় খালে জল। বিলে জল, মাঠে জল, পথে জল, তবু পেলুমনা একফোঁটা জল। তৃষ্ণা আমার জমানো-জল দেখে শুধু বেড়েই চলেছিল দিদি। হ্যাঁ, স্বর্গ তুমি চাওনা, নরক মানে, মাটির পৃথিবীই তোমার কাম্য—কথাটা তো নেহাৎ সুবিধের নয় দিদি! হিন্দু বলো, মুসলমান বলো, খৃষ্টান বলো—স্বর্গ পাওয়ার লোভেই-না এজন্মে পুণ্যকাজ ক'রে যায়! এ দৃষ্টান্ত তো বিরল নয়।"

বরুণা হেসে ওঠে—"আমি ওদের ব্যতিক্রম সোমেশ। আমি স্বর্গ মানিনে, নরক মানিনে, মানি এই ধূলার ধরণীকে। সুখ-

দুঃখময় এই পৃথিবী, এই পৃথিবীর মানুষ আমি, পাপ-পুণ্যও আমি মানিনে। আমার অন্তর যাতে শান্তি পায়, মানুষের শাস্ত্রে তা পাপ ব'লে উক্ত হলেও, আমি জানি, সেই পরম পুণ্য।"

সোমেশ চোখ দুটি বিস্ফারিত ক'রে বললে, "কথাটা তোমার মুখে ঠিক মানায় না দিদিমণি, তুমি তো সেই রাধামণিরই জাত, যে, খ্যাদার ওপর রাগ ক'রে তাকে মেরে-ধ'রে চ'লে গিয়েছিল, তারপর পনেরো দিন বাদে কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে এসে আবার সুখের-সংসার পাতলে! পাপ-পুণ্য আর সুখ-নরক তোমাদের অস্থিমজ্জায় কেমন যেন জড়িয়ে থাকে।"

বরুণা মাথা নাড়ে—"কিন্তু, আমি তো বলেছি সোমেশ, আমি ব্যতিক্রম! ছোটবেলা হতে আমি যে আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষ হয়েছি, সেখানে এসব কথা পৌঁছোয়নি, তারপর যে-পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এসে পড়লুম, এর সান্নিধ্যে এসে ওসব বালাই ছিলনা। আমার মনে ওসব সংস্কার জন্মায়নি। যা করবো তা সত্যি জেনেই করবো, রাধার মত ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য হিসেব ক'রে চলবো না।

সোমেশ জিজ্ঞাসা করলে, "পাপ-পুণ্য মানো না? সাংঘাতিক কথা তো?"

বরুণা হাসলে—"সমাজচ্যুত করবে? সে তো হয়েই আছি। ক্ষুদ্র-সমাজের গণ্ডী ছাড়িয়ে যে বৃহত্তর-সমাজে প্রবিষ্ট হয়েছি, সেখানে অত ছোট নিয়ে বিতণ্ডা চলেনা। আচ্ছা, একটা কথা বোঝাও। একজনের কাছে যা পাপ, অপরের কাছে তা পুণ্য ব'লে

পরিগণিত হয় কেন ? সাপ, ব্যাং ধ'রে খায়। সেখানে তারা খাদ্য ও খাদক। কিন্তু, জীবহত্যা—শাস্ত্রে মহাপাপ নামে লেখা আছে। এইরকম আরও যথেষ্ট উদাহরণ আছে সোমেশ। আমরাও-তো মাছ খাই, মাংস খাই, সেগুলো কেন মহাপাপ নামে ঘোষণা করা হয়না ?"

সোমেশ চিন্তিতমুখে বললে, "নিজের তাগিদে হয়তো পাপ নয়, অপরের তাগিদেই পাপের আতিশয্য উক্ত হয়ে থাকে নিশ্চয়ই।"

তারপরই সে সোজা হয়ে বসে…

"যাই বলো, শাস্ত্রগুলো বড় একচোখো, অর্থাৎ, ওর মধ্যে পক্ষপাতিত্ব যথেষ্ট দেখা যায়। ভয় দেখিয়ে যাকে বাধ্য করা যায়না—সেইরকম কাজ শাস্ত্র স্বচ্ছন্দে মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ, দুর্ব্বলের ওপর উৎপীড়ন চলেছে চিরন্তনভাবে, সবলকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হয়েছে। আসল কথা, যুগে-যুগে দুর্ব্বলতা পাপ ব'লে গণ্য হয়ে এসেছে, সবল বা শক্তের জয়জয়কার যুগে-যুগে ঘোষিত হয়েছে। আশ্চর্য্য দেখ দিদি, তোমার মতের সঙ্গে আমার মত একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে। মিললো না কেবল ওই অতিশিক্ষিত আর অতিজ্ঞানী লোকটির সম্বন্ধে। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম আর পাপ-পুণ্য নিয়ে এমন চুলচেরা হিসেব আজও ক'রে আসছেন, সব হারিয়েও আজ সেই এতটুকু রাখবার যা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চলছে, যা দেখে লোকে, উনি মাথা-পাগল ছাড়া আর কিছুই বলবে না।"

পরেশ এতক্ষণে পত্রের ওপর হতে চোখ তুলে, মৃদু হেসে বললে, "লোকে বলুক না-বলুক, তুমি তো ব'লে আগে হতে শান্তিটা লাভ ক'রে ফেললে সোমেশ! আমিও একটা কথা বলি, জোর ক'রে নাস্তিক হয়েই বা কি লাভ। থাক স্বর্গ-নরক, থাক পাপ-পুণ্য, আমাদের তা নিয়ে আলোচনা করারও তো কোনো হেতু নেই।"

বরুণা বললে, "তবু কল্পিত কতকগুলো যা-তা জিনিসকে মেনে নিতে বলো তুমি? দুর্ব্বলেরাই মেনে নেবে স্বর্গ নরককে, ভগবানকে, আর সবল চিরদিনই আঘাত ক'রে ভাঙতে চাইবে···"

পরেশ হাত তোলে, থামো। ভাঙতে চাইলেই কি ভাঙতে পারবে? কেবল আজ নয়, যুগে-যুগে সবল আঘাত ক'রে আসছে, কিন্তু, পেরেছে কি মিশিয়ে দিতে? দোষে-গুণে মিলিয়ে মানুষ হয় মানুষ। কেউ বলতে পারেনা আমি অভ্রান্ত···আমি সত্য···আমার মধ্যে মিথ্যে নেই। মানুষ কোনোদিন এতবড়ো জোরের কথা বলতে পারেনি বরুণা, অতবড়ো জ্ঞান মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বহন করতে পারেনা বলেই সে পাগল হয়ে যায়। জ্ঞানের সীমা আছে। সেইপর্য্যন্ত পৌঁছোলে তুমি ফিরে চেয়ো পেছনের দিকে। যা পেয়েছো তারই আলোচনা করো, অসীমের দিকে ছুটোনা। থাকনা আমাদের ওইটুকু দুর্ব্বলতা,—প্রার্থনার বাণী আমরা যেন না হারিয়ে ফেলি—দুঃখে, বিপদে পড়লে একটা আশ্রয় আছে···একজন কেউ দেখছেন, এ কল্পনাও যে অনেক শান্তিপ্রদ মনে হয় বরুণা।"

বরুণা, পরেশের মুখের ওপর দৃষ্টি রাখে—"কিন্তু, ওই দুর্ব্বলতাই যে জাগায় মনে হাজার সংস্কার, ছোট-বড়োর ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, এমন কি—"

পরেশ বললে, "ভুল বুঝছো বরুণা। অসীমের মধ্যে কেন, ওর ধারণাই তুমি করতে পারোনি। যতখানি পেরেছো ব'লে আনন্দ করছো, সত্যি তার এতটুকুও পাওনি। তবে হ্যাঁ, কর্ম্মী-হিসেবে তুমি বড়ো হতে পারো—মানুষ-হিসেবে তুমি বড়ো হতে পারোনি এ জোরায় ব'লে দিচ্ছি। শাস্ত্রে আছে, 'আত্মানং বিদ্ধি।' আগে নিজেকে চেনো, তারপর সংসারকে, জগৎকে চিনতে চেষ্টা করো, এই আমার এক কথা।"

বরুণা চোখ নামিয়ে নেয়, পরেশের শুষ্ক অথচ দৃপ্ত মুখের পানে সে তাকাতে পারছিল না।

সোমেশ এর মধ্যে চট্ ক'রে পরেশের পায়ের ধুলো—বাধা দেওয়ার আগেই মাথায় তুলে নেয়…

"ক্ষেপিয়ে দিলুম, তাই-না এতগুলো কাজের কথা শোনা গেল! যাক, সমস্ত জীবনটা ধ'রে তুমি স্বর্গ নরক, সয়তান আর তেত্রিশকোটি দেবতা, পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগাভাগি করো পরেশদা,—স্বর্গে সে যাবেই এই সুমহান কর্ম্মবলে তাতে তো অণুমাত্র সন্দেহ নেই! দয়া ক'রে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ো দাদা, যেন তোমায় ছুঁয়ে চলতে পারি। তোমার কথায় স্বর্গের ওপর আমার নিদারুণ লোভ প'ড়ে গেল পরেশদা। দিদি তাঁর মাটির পৃথিবীতেই কারবার চালাবেন বাপু, আমি যেন স্বর্গে যেতে পারি এইটুকু দেখো।"

পরেশ সস্নেহে হাসে।

কি সে বলতে যাচ্ছিলো, বাইরে হতে কে ডাক দিলে, "বাবু, বড়োবাবু জিনিস পাঠিয়েছেন, দরজা খুলে দিন।"

বরুণা নেমে গেল উঠোনের দরজা খুলতে।

সোমেশ বিস্ময়ের ভাণে জিজ্ঞেস করে, "বড়োবাবুটা কে? কি জিনিস তিনি পাঠালেন?"

পরেশ উত্তর দিলে—"বড়োবাবু, মাধব কাকা। কাল রাত্রে নাকি ফিরেছেন এখানে। মিলে ষ্ট্রাইকের হাঙ্গামা চলছে কিনা। তা, উনি লোক ভালো। কলকাতা হতে আজ ক'দিন রোজ জিনিস পাঠাচ্ছেন—বেদানা, আঙ্গুর, আপেল, হর্লিক্স, তারপর নানারকম ওষুধ। অর্থাৎ, উনি আমায় বাঁচিয়ে তুলবেনই। কোনোদিক দিয়ে অপূর্ণতা রাখবেন না বলেছেন।"

বরুণা দরজা খুলতে, একজন লোক কতকগুলো ফল-ভরা একটি পাত্র নামিয়ে দিলে, বললে, "বড়োবাবু ওবেলা একবার আসবেন ব'লে পাঠিয়েছেন, আপনি বাড়ী থাকবেন।"

সে চ'লে গেল।

সোমেশ আনন্দের ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে ওঠে—"এক্সেলেন্ট··· ক্যাপিটাল! পরেশদা, ভাই, তুমি নেহাতই বাঁচবে দেখছি। তুমি যতোই মরবে-মরবে করোনা কেন, মরা তোমার কিছুতেই হবেনা—কিছুতেই না।"

পরেশ অত্যন্ত নিষ্প্রভভাবে হাসে—"বুঝেছো তো সব। আরও কিঁ বলতে হবে, সোমেশ?"

সোমেশ মুহূর্ত্তে গম্ভীর হয়ে যায়, বলে, "এর চেয়ে বড়ো হিতৈষী আর কোথায় পাবে, পরেশদা? তোমার শয়নে-স্বপনে জাগরণে একজন লোকের সদা-সতর্ক দৃষ্টি তোমার ওপর প'ড়ে আছে—এত সৌভাগ্য হবে কার?"

বরুণা জিনিসগুলো পরেশের টেবলের ওপর সাজায়। অসময়ের কমলা, কয়েকটা আম, আপেল, আঙ্গুর, তাছাড়া আছে, ভালো পাঁউরুটি, বাটার, বিস্কুট—

সোমেশ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে বললে, "তোমার সর্ব্বস্ব উনি গ্রাস করেছেন সত্যি, কিন্তু আবার তোমার জন্মে খরচও করছেন নেহাৎ মন্দ নয় পরেশদা। এসব সাহেব-পাড়ার জিনিস, স্বদেশীয়ানার নাম গন্ধ এতে পাবেনা। উঃ, কি পরোপকারী লোক। তোমার হিতার্থে উনি সর্ব্বস্ব দান করতেও পারেন।"

বরুণা বিকৃতমুখে বললে, "নিতে চাইনি, একদিন নিজের হাতে এনে বললেন, 'নিতেই হবে বউমা।' যতক্ষণ না নিলুম ততক্ষণ এক-পা নড়লেন না। আমি লোক চিনি সোমেশ, ওঁর এই আতিশয্যের মূলে এখনও যা উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাও আমার অজানা নেই।"

উদারভাবে সোমেশ বললে, "আর কেন দিদি, যা দিচ্ছেন তা নিয়ে নাও, ফিরিয়ে দিয়োনা, এরপর একটা দিক দিয়ে মস্ত বড়ো ক্ষোভ থেকে যাবে। তুমি জেনেছো, এ তোমায় ঘুস দেওয়া, সোজাকথায় তোমার বাড়ীকে চৌকি দেওয়া,

সঙ্গে-সঙ্গে এটাও জেনো, উনি তোমায় বউমাই বলুন আর যাই করুন, তুমি যে বহ্নিশিখা, সেটা উনি এক-আঁচেই জেনে নিয়েছেন। তুমি অসঙ্কোচে জিনিস নাও, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন রোগীর পথ্য ফিরিয়ে দিয়ে কেন পস্তাবে? মাটির পৃথিবী, স্বর্গ নয় দিদিমণি—এখানে শুধু দেবতা নেই, দেবতার পাশে সয়তানও বাস করছে।"

বরুণা নিস্তব্ধে উদাসভাবে কোন্‌দিকে তাকিয়ে থাকে।

পরেশ পত্রখানা সরিয়ে দেয়—"দেখ, সেদিনকার তোমাদের মিটিংটা পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মিটিংয়ে যারা উপস্থিত ছিল তাদের নাম আর বক্তৃতার বিষয় পুলিস জেনেছে। তড়িৎ বোস একবার এখানে আসতে চাচ্ছে, তোমার মত চেয়েছে।"

বরুণা পত্রখানা তুলে বললে, "না, এখন থাক। মাধববাবু এখানে এসেছেন, দরকার নেই কারও এসে।"

পরেশ বললে, "কিন্তু, ভয় করেও তো কোনো কাজ হবেনা বরুণা!"

বরুণা শুষ্ককণ্ঠে বললে, "সময় যথেষ্ট আছে, বিপুল বসুধার কাজ করবার স্থান এবং সময় মিলবে, কিন্তু যে এতটুকু স্থানের মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ হয়েছি, সেখানকার এতটুকু স্বার্থপূর্ণ কাজই আগে আমায় শেষ করতে দাও। তারপর...তারপরও আমি যদি ফুরিয়ে না যাই, জ্বলে উঠবো, জ্বালিয়ে দেবো চারিদিক, একথা আমি আজ শুধু তোমায় ব'লে রাখছি।"

সোমেশ প্রশ্ন করে—"কিন্তু, বন্দিনী সীতার উপায় ?"

পরেশ হেসে ওঠে, বলে, "মাথায় কি রামায়ণের গল্প জেগেছে সোমেশ ?"

সোমেশ বললে, "রাম-রাবণ সে রামায়ণে নেই পরেশদা, কুম্ভকর্ণ মন্দোদরীও বাদ, আছে শুধু বন্দিনী সীতা। রাবণ আজ নেই,—স্বর্ণ-কিরীটিনী লঙ্কাও আজ বিলুপ্ত হয়েছে—তবু তার অশোকবন আজও আছে, দুরন্ত চেড়ি-পরিবৃতা বন্দিনী সীতা আজও সেই অশোকবনে কেঁদে ফিরছে। তার কান্না আমি কেবল শুনিনি দিদি, তোমরাও শুনেছো! সীতা কাঁদছে—আমায় উদ্ধার করো—আমায় মুক্তি দাও। ও তো রূপক গল্প দিদিমণি, তবু সত্য জেগে রয়েছে ওরই মধ্যে। ওই সীতাই যে বন্দিনী-ভারতের প্রতীক—নিজ্জিত-ভারতের আত্মা। আজ জাগবে কে দিদি,—জাগবো আমরা—আমরা করবো আন্দোলন, আনবো গণ-জাগরণ, এই মুক্তি-আন্দোলনকে নূতন রূপ দেব আমরা—এই যজ্ঞে আহুতি হবে ওই ওরা—যারা আজ স্নেহের ভাণে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে আমাদের ওপর, যারা দিচ্ছে ঘুস—যারা—"

পরেশ বাধা দেয়, "থাক, থাক সোমেশ, আর ওসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না।"

মাথার রুক্ষ চুলগুলোর মধ্যে সে আঙুল চালিয়ে যায়, জায়গাটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আসে।

ষোল

মাধব দাস ফিরেছেন।

এখানকার জমিদার ও বড়ো ব্যবসায়ী মাধব দাস। নিজে তিনি বালিগঞ্জে থাকেন, এখানকার কল-কারখানার কাজ চালান, তাঁর সম্বন্ধী, ম্যানেজার জানকীবাবু। মিলের লভ্যাংশটা তিনি পান, মাঝে-মাঝে দেখে যান, গোলমাল বাধলে মীমাংসা করেন।

দেশের বাড়ী নূতন ক'রে তৈরী হয়েছে। প্রকাণ্ড বড়ো গেটের দু'দিকে দু'খানা প্লেটে একদিকে পিতার নাম, আর-একদিকে হাকিম শুভেন্দুদাসের নাম, তার নীচে বড়ো-বড়ো অক্ষরে বি, সি, এস অক্ষর তিনটে সোনালী-রেখায় পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

গৃহ প্রবেশের দিন।

মাঠে ধান হয়নি—চাষীরা না খেতে পেয়ে মরেছে, কত লোক গ্রাম ছেড়ে চ'লে গেছে আর ফিরে আসেনি, তাতে ধনী মাধব দাসের কিছু যায়-আসেনা।

গৃহ-প্রবেশের ব্যাপার।

রায়বাহাদুর সপরিবারে এসেছেন, এক ছেলে তাঁর মহকুমা হাকিম, আর-এক ছেলে পুলিসের ইনেসপেক্টার, মেয়ে বনানী—স্কটিশচার্চ-কলেজে বি-এ পড়ে।

তিনদিন ধ'রে বাড়ীতে মহাসমারোহ ব্যাপার চলছে। আহুত,

অনাহুত, রবাহুত—বাদ রইলো না কেউ, যেন রাজসূয় যজ্ঞ আর-কি!

পরেশ আসতে পারবে না—প্রকাণ্ড বড়ো থালায় ক'রে তার বাড়ীতে তিনদিন ধ'রে খাবার পাঠানো হ'ল। হোক সে আজ দরিদ্র, তবু সে মাধব দাসের আত্মীয়, সম্পর্কে ভাইপো। মাধব দাসের মন অনুদার নয়। পরেশকে তিনি তাঁর বাড়ীর সমারোহ ব্যাপার হ'তে বাদ দেননি।

সোমেশকে নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও সে গেলনা। বাদলার ক'দিন তো বাড়ীতে তার চিহ্নমাত্র দেখা যায়না, দুপুরে মুহূর্ত্তের জন্যে একবার বাড়ী ফিরে বাহয় দুটো নাকে-মুখে গুঁজে বার হয়ে যায়, তারপর গ্রামের সমস্ত খবর সংগ্রহ ক'রে সে একেবারে অন্ধকার হ'লে বাড়ী ফেরে।

"দাদাবাবু গো! বুড়োকত্তা সুধুলো, আপনি কোথায় গেছ, বাড়ীতে আছ কিনা, কি কাজ করতি লেগেছো, কে-কে আসে, এইসব কথা।"

মহা উৎসাহে সে সোমেশের পা দুখানা নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে টিপতে বসে।

নিতান্ত অনভ্যস্ত ব্যাপার, এ-পর্য্যন্ত কেউ যে তার পদসেবা করেছে তা সোমেশের মনেই পড়েনা। বাদলের সজোর পেষণে সে পরিত্রাহী চেঁচিয়ে ওঠে, "উঃ, ছাড়, বাপু, পা ছাড়, তোকে আর সেবা করতে হবেনা, এমনই বরং গল্প কর, সে ভালো।"

অপ্রস্তুত বাদল তাড়াতাড়ি পা ছেড়ে দিয়ে, পায়ের দিকে

বিশেষ ক'রে দেখতে-দেখতে বললে, "কই, ফোড়া-পাঁচড়া তো কিছু হয়নি দাদাবাবু? পায়ে একটু তেল মালিস ক'রে দেব? মচকে গেছে বোধহয়?"

সোমেশ বললে, "না রে বাপু, না। কিছুই হয়নি। পা টিপলে আমার পা জ্বালা করে। তারপর, বুড়োকর্ত্তা আর-কিছু বললে নাকি?"

বাদল গম্ভীরমুখে উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, অত ছেলেমানুষ আমি নই দাদাবাবু। বুড়োকত্তার সেই পুলিস-ছেলে একজন আছে না? আমায় ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সে কি গায়ে হাত-বুলোনোর ধুম—কে-কে আসে, কি দুটো নাম বললে—তারা দু'জন আসে কিনা—"

সোমেশ বললে, "সত্যবান আর মজিদ?"

বাদল সোৎসাহে বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই দুটো নামই তো। তারপর, আর কে আসে, আপনি কি করেন, কতগুলো ক'রে পত্র আসে, কতগুলো যায়—সে কত কথা। আজ নেমন্তন্ন ছিল, কেন তুমি যাওনি এ-কথাও বললে। তারপর আমায় পাঁচটা টাকা দিতে এসেছিল, আমি কিন্তু একটা কথার জবাব দিইনি দাদাবাবু। তারপর বুড়োকত্তা আমায় খেতে বললে, কিন্তু আমি কেন খাবো ওদের বাড়ী—আমার জাত যাবেনা?"

"জাত যাবে—"

সোমেশের মুখে হাসির রেখা ফোটে।

এইটুকু ছেলে, সেও বলে জাতের কথা। মাধব দাস আর

যাই হোন, কিন্তু জাতে নিকৃষ্ট এ-কথা গ্রামের লোক ভুলতে পারেনা। সমাজে পাঁচজনের সামনে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মাধব দাসের মন রাখতে, প্রকাশ্যে কারও নিমন্ত্রণ খাবার সাহস হয়নি, কিন্তু লুকিয়ে সবাই খেয়েছে, কেউই বাদ যায়নি। মাধব দাস এবার নির্দ্দয় প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করেছেন, আগামী-কাল গ্রামের ব্রাহ্মণ-সমাজ প্রকাশ্যভাবে নিমন্ত্রণ খাবেন এবং প্রত্যেকে পাঁচটাকা ক'রে ভোজন-দক্ষিণা পাবেন। এমনি ক'রে তিনি সমাজের গোঁড়ামী দূর করতে চান।

পাঁচটাকা ভোজন-দক্ষিণা। হোক নমঃশূদ্র, তবু তাঁর বাড়ীতে আসবে গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ সবাই। আসবে না কেবল সোমেশ। জাতিভেদের জন্যে নয়, ধনী ও দেশের শত্রু মাধব দাসকে সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে সেইজন্যে।

গ্রামের আধুনিক দেশসেবা-ব্রতে-ব্রতী ছেলেরা দেশের এই দুর্দ্দিনে মাধব দাসের এই উৎসবে বাধা দেবে ব'লে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল, তারা স্পষ্টই বলেছিল, "কশাইয়ের মতন যে লোক আজকের দিনেও চালের ব্যবসায় ব্ল্যাক-মার্কেটিং ক'রে গরীবদের হত্যা করছে, তার বাড়ীতে কেউ যেন পদার্পণ না করে।"

শুনে বৃদ্ধেরা শিউরে ওঠেন, "ও-কথা মুখেও এনোনা বাপু! যদি কোনোরকমে মাধব দাসের কানে যায়—ভিটেমাটি চাটি করবে। একে সে আধখানা গ্রাম জুড়ে মিলের মালিক, তার ওপর জমিদার। এরও ওপর আছে তার এক ছেলে হাকিম, আর এক ছেলে বড়ো দারোগা—ধরবে আর জেলে পুরবে।"

যে-কোনো সূত্রে হোক কথাটা দেশে এসেই মাধব দাস শুনেছেন। কিন্তু ওসব বাজে-কথায় কান দেবার তাঁর দরকারই-বা কি! ওই যে গেটের ওপর পত্‌পত্‌ ক'রে উড়ছে মস্ত বড়ো একটা কংগ্রেস-পতাকা—তাঁকে বোঝবার পক্ষে ওইটেই যথেষ্ট।

সোমেশ দাঁতের উপর দাঁত রাখে—"সয়তান!"

আজ মাধব দাসের দরকার হয়েছে এই কংগ্রেস-পতাকার আড়ালে আত্মরক্ষা করবার, জনগণের সহানুভূতি পাওয়ার। বাইরের সম্মান, রায়বাহাদুর উপাধি, ছেলেদের সম্মানের চাকরি, সবই পাওয়া হয়েছে, এখন দৃষ্টি পড়েছে—এ-ছাড়াও চাই। জনগণকে বাদ দিলে চলবে না।

তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শুভ ছিল সোমেশের সহপাঠি, এই গ্রামের স্কুল হতেই তারা ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। সেদিন মাধব দাস ছিলেন ব্যবসায়ী, দৃষ্টি অনেক ওপরে থাকলেও, কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারতা ছিলনা।

আজ পাশা ঘুরেছে।

মাধব দাসের চলছে বৃহস্পতির দশা—যা তিনি ধরছেন তাই সোনা হয়ে ফুটে উঠছে। স্পর্শমণিই পেয়েছেন হয়তো!

ছেলেরা এসে পড়েছিল সোমেশের কাছে—"না, এ দেখা যায়না—সওয়াও যায়না সোমেশদা। চিরদিন যারা ইউনিয়ন-জ্যাকের ফ্ল্যাগ উড়িয়েছে বাড়ীতে, আজ তারা কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ উড়িয়ে রীতিমত অপমান করছে কংগ্রেসকে। জানো, সোমেশদা, দেশের যতো বড়ো শত্রুতা ক'রে এই লোকটা রায়বাহাদুর উপাধি

পেয়েছে ? তোমার আর পরেশদার জেলে যাওয়ার কারণও ছিল ওই পাষণ্ডটা। ওর এক-ছেলে মহকুমার হাকিম, আর-এক ছেলে পুলিসের দারোগা। তারা উপস্থিত থাকতে সেই বাড়ীতে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ ওড়ানো মানে, কংগ্রেসকে একেবারে নীচু করা।"

জনকয়েক ছেলে রুখে উঠে বলে, "আমাদের একবার বলো সোমেশদা, আমরা জোর ক'রে ওই ফ্ল্যাগ নামিয়ে দিই।"

সোমেশ বাধা দিয়েছে, বলেছে, "পাগলামি করোনা ভাই সব, জোর ক'রে ওই পতাকা নামাতে যাওয়া মানে, অনর্থক একটা সংঘর্ষের সৃষ্টি করা বইতো নয়। আমাদের তাতে এমন-কিছু ভালো হবেনা। আবার হবে সেই ধরপাকড়, আবার সেই বিচারের প্রহসন—তারপর সোজা যেতে হবে আবার জেলখানায়। একদিন দেশের লোকদের এই মুক্তি-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করতে আমাদের বিপ্লবের আয়োজন করতে হয়েছিল সবদিক দিয়ে, কিন্তু আজ আর তার দরকার নেই। জেলে গিয়ে ভারতের মুক্তি-সাধনার তপস্যায় কালক্ষয় করা আজকের দিনে সব-চেয়ে বড়ো কথা নয়। আমাদের বাইরে থেকে কাজ ক'রে এগুতে হবে। অনর্থক এখন মারামারি করবার দরকার নেই।"

আজই সকালে এসব কথা হয়ে গেছে—

তাই বাদলা, জাতের কথা তুলতে সোমেশ হাসলে, বললে, "জাত কি রে বাদলা, জাত নিয়ে আবার কি হলো তোর ?"

গলার আওয়াজ নামিয়ে বাদলা বললে, "ওরা যে জাতে

ছোট গো দাদাবাবু। ওদের জল চলেনা যে। দাদু ব'লে দিয়েছে, ওদের হাতের জল পর্য্যন্ত খেতে নেই। তাইতো আমি খাইনি; অমন ভালো-ভালো খাবার ফেলে রেখে চ'লে এসেছি।"

সোমেশ গম্ভীর হয়ে ওঠে।

বাদলা আবার বলতে থাকে, "কি সুন্দর একটা মেয়ে এসেছে গো দাঁদাবাবু, ঠিক যেন মেম-সাহেব! দেখতে একেবারে যেন মা-দুর্গার মতন, কেবল মাথার চুলগুলো কাঁধ পর্য্যন্ত— যেমন কোঁকড়ানো তেমনি নদীর ঢেউয়ের মতন। পায়ে আবার কি সুন্দর জুতো গো! তোমাদের মতন অমন বিচ্ছিরী মোটা-মাথা ভোঁতা-জুতো নয়। সেই জুতো প'রে যখন টুকুস-টুকুস ক'রে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়, সে আর কি বলবো গো দাদাবাবু—ইস্!"

ভাবাবেশে বাদলা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ঊর্দ্ধ-চক্ষুতে সে বোধহয় জুতোর স্বপ্নই দেখে।

বনানী এসেছে। মাধব দাসের কন্যা বনানী। স্কটীশে ফোর্থ-ইয়ারে পড়ে সে।

সোমেশ খোলা-জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চায়। আকাশ পরিষ্কার…নীল রংটা যেন আরও ঘন হয়ে উঠেছে।

"দাদাবাবু!"

বাদলার বিনয়নম্র-কণ্ঠে কি আকুতি!

সোমেশ কেবল উত্তর দেয়, "হুঁ।"

বাদলা সঙ্কুচিত-কণ্ঠে বলে, "আমাকে অমনি একজোড়া

জুতো কিনে দেবে দাদাবাবু? কতই-বা আর দাম হবে, এক টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে হয়তো। আমার পা তোমাদের চেয়ে ঢের ছোট দাদাবাবু। ওইরকম একজোড়া জুতো যদি সত্যি কিনে দাও…”

এতক্ষণে বাদলের সেবার মূল কারণ বোঝা যায়। বাদলের মতন ছেলে এই যে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে শান্তভাবে ব'সে আছে এর অর্থ এতক্ষণে বোঝা গেল।

সোমেশ হাসি চেপে বললে, “ও যে মেয়েদের পায়ের জুতো রে! ও-জুতো পরলে লোকে তোকে কি বলবে জানিস? মুখ দেখাতে পারবি নি যে। তার চেয়ে আমি তোকে বেশ ভালো জুতোই কিনে এনে দেবো কলকাতা হ'তে। এখন যা দেখি, আমায় একটু লেখাপড়া করতে দে। তোর গল্পের চোটে আমার কোনো কাজই হলোনা।”

অনিচ্ছাসত্বেও বাদলা উঠে যেতে বাধ্য হয়।

খ্যাঁদা ও রাধা এসে সোমেশকে প্রণাম করে। পূজোর আগেই খ্যাঁদা চমৎকার একখানা শাড়ি কিনে এনেছে, সেই শাড়ি প'রে রাধাকে মন্দ দেখাচ্ছে না।

সলজ্জ-হাসি হেসে রাধা বললে, “বামুনের ছেলে তুমি দাদাবাবু, আশীর্ব্বাদ করো, ও যে কাজটা পেয়েছে সেটা যেন ঠিক-মতন করতে পারে। এ-মাসের মাইনে পেয়েই এই কাপড়খানা কিনে এনেছে তাই তোমায় দেখাতে এলুম।”

কাপড়ের ভালো-মন্দ না বুঝলেও সোমেশ তারিফ করে—"বেশ কাপড়, চমৎকার কাপড় হয়েছে। কাপড়খানা কিনতেও কম টাকা খরচ হয়নি দেখছি। এখনও চালের দাম কমলো না, দুর্ভিক্ষে এখনও লোক মরতে কসুর নেই, এখন এতদামে কাপড় নাহয় নাই কেনা হতো।"

রাধা একেবারে মুসড়ে পড়ে, বলে, "ওকথা আমিও বলেছিলুম, কিন্তু আমার কথা ও-তো শুনলে না, কাপড় এনে হাজির করলে একেবারে।"

খ্যাঁদা বিনীতকণ্ঠে বললে, "আমি ও-মাস হ'তে জমিদারবাবুর কাছে কাজ করছি বাবু। মাস গেলে তিরিশ টাকা মাইনে আর খাওয়া-পরা। অত টাকা কি করবো বাবু, তাই কাপড়খানা কিনে ফেলেছি। আবার আসছে-মাসে পাবো তিরিশ টাকা—তার পরের মাসে আবার তিরিশ—তখন নাহয় রাখবো বাবু।"

"তিরিশ টাকা আবার খাওয়া-পরা—কি কাজ করতে হয় খ্যাঁদা?" বিস্মিতভাবে সোমেশ প্রশ্ন করে।

মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বিনীত-হাসি হেসে খ্যাঁদা বলে, "কাজ এমন কিছু নয় বাবু, বড়োকর্ত্তার কাছে-কাছে থাকা, সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ানো, খবরদারী করা। বড়োকর্ত্তার পুলিসের দারোগা যে ছেলে আছেন না? তিনিই আমায় কাজে বাহাল ক'রে গেছেন।"

এইরকম পাঁচ-কথার পরে স্বামী-স্ত্রী দুজনে চ'লে গেল প্রণাম সেরে।

পিসীমার জরুরী-পত্রখানা পেয়ে সোমেশ কলকাতায় যাবার

উদ্যোগ করছিল। নিজেরও দরকার ছিল কিছু টাকা সংগ্রহ করবার। সুজিতকে সে পত্র দিয়েছে, সুজিত টাকা সংগ্রহ করেছে।

বর্ষা কেটে গিয়ে এসেছে আশ্বিন মাস—শরতে হবে শারদীয়া অর্চ্চনা। গ্রামের মরা-বিল আজ জীবন্ত হয়ে উঠেছে, বিলের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে সবুজ-পদ্মের পাতা, তার মাঝে-মাঝে মাথা তুলেছে পদ্মফুল, কোনোটি ফুটেছে, কোনোটি কুঁড়ি। শরৎ এসেছে, কিন্তু পূজার উৎসব এবারে বাংলাদেশে নেই। ওদিকে চলেছে পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ, সাইরেন ও বোমার নির্ঘোষ, এদিকে চলেছে দুর্ভিক্ষ, মহামারী। মরণ যে কতো সহজ তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—বেঁচে থাকাটাই বরং এখন কঠিন ব'লে মনে হয়।

সতেরো

সোমেশ গুণগুণ ক'রে গাইতে-গাইতে চলে :

'অত চুপি-চুপি কেন কথা কও ওগো মরণ
হে মোর মরণ,
মুখপানে কেন চেয়ে রও —
ওগো, একি প্রণয়ের ধরন!'

পরেশ একটা সোফায় বসেছিল, বরুণা সেদিনকার আনন্দবাজার পড়ে শোনাচ্ছিলো, এমন-সময় গুণগুণ ক'রে গান গাইতে-গাইতে

সোমেশ এসেপড়ায় পড়া বন্ধ ক'রে বরুণা কাগজটা সরিয়ে রাখলে।

পরেশ জিজ্ঞাসা করলে, "আজ হঠাৎ মরণের স্তুতিগান স্থুরু হলো কেন সোমেশ ?"

সোমেশ গান থামিয়ে বললে, "চারিদিকে মরণের যা জয়ভেরী বেজেছে দাদা, স্তুতি না ক'রে আর নি[illegible] আছে ? সেদিন স্বরূপনগরের পথে আসতে, কম-সে-কম [illegible]-বারোটা মড়া দেখলুম। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলুম, ভা[illegible]—চমৎকার ! আচ্ছা, বলো দেখি পরেশদা, বাংলাদেশে এ[illegible] কল্পনা কেউ কোনোদিন করতে পেরেছে কি ?"

পরেশ সংক্ষেপে বললে, "না করলেও ক[illegible] হবে ভাই ! তোমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে আগামী-ভ[illegible]তের জন্যে। এইতো সবে স্থুরু। এর চেয়ে আরও বড়ো-কিছু আসবে—আসবে মড়ক, ভূমিকম্প, ঝড়, অগ্নিকাণ্ড…"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সোমেশ বললে, "কলকাতায় যাচ্ছি পরেশদা। আজই রওনা হচ্ছি তাই দেখা করতে এলুম। আমাদের কুমুদ, জিতেন আর মহিম গেছে হাজতে—তারা নাকি পুলিসের বিরুদ্ধে এইসব ক্ষুধিত লোকগুলোকে উত্তেজিত করেছিল সেই অপরাধে ধরা পড়েছে। ওদের কেস চালাতে হবে, দক্ষিণপাড়ায় যে ক্যান্টিনটা খোলা হয়েছে তার খরচ চালাতে হবে, তাই কিছু টাকা এখন আমার চাই। যাচ্ছি পিসীমার ওখানে, স্থুজিত টাকা যোগাড়

করেছে, নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু, আর তো দেখা যায়না পরেশ দা, সহ্য করাও চলেনা। শেয়াল-কুকুরের মতন মানুষ মরে এ-দেশে, বিনা-বিচারে জেলে পচে মরে এই দেশের ছেলেরাই। আরও কতো দেখবো বলো দেখি ?”

পরেশ স্মিতহাসি হাসে—

“দেখতেও হবে, সইতেও হবে ততদিন—যতদিন আমরা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে জোর ক'রে বলবো, আমরা চাইনা পরের শাসন,—আমরা নিজেরাই দেশ রক্ষা এবং শাসন করবো। আজ যে চোখ রাঙিয়ে শাসন করছে, ইচ্ছামত আমাদের দেশের জিনিস অন্যদেশে চালান দিচ্ছে, দেশের লোক মরলেও যারা তাকিয়ে দেখেনা, চাই তাদের উচ্ছেদ। আমি অনেক আগেই বলেছি, একটা মানুষ মেরে, একটা ডাকাতি ক'রে, আগুন লাগিয়ে এ-কাজ হবেনা, তাতে আমরা স্বাধীনতা পাবোনা। আমাদের সব এক হ'তে হবে, উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, তবে আমরা যা চাই তা পাবো, নচেৎ আমাদের ব্যর্থই হ'তে হবে পদে-পদে। আজ আমাদের সঙ্গে হাত মেলাক ওই মিলিওনেয়ার মাধব দাস, তার হাকিম আর পুলিসের ইনেস্পেক্টার ছেলে ;—সবাই মিলে যদি আমরা আমাদের প্রাপ্য দাবি করি, কতক্ষণ সে দাবি উপেক্ষা করা চলবে সোমেশ ? কিন্তু তা তো আজও হয়নি। আমাদের চলাফেরা দেখছে এই বাংলার পুলিস—তারাও বাংলারই ছেলে। বিচার করছে বাংলার বিচারক, সেও বাংলার ছেলে। কিন্তু, আইনটা শাসক এমন-

ভাবেই তৈরী করেছে, নির্দ্দোষী জেনেও সেই আইনের প্যাঁচে এরা ফেলেছে আমাদের। ইচ্ছে থাকলেও মুক্তি দেওয়ার যো নেই। চাকরির মোহটাও তো বড়ো কম নয় সোমেশ, এই মোহপাশে আজ সবাই জড়িয়ে পড়েছে বলেই অনিয়ম, অবিচার সব-কিছু সম্ভব হয়েছে। যেদিন সবাই একসঙ্গে চাকরি ছেড়ে দেবে, সবাই বলবে আগে আমাদের প্রাপ্য আমাদের দাও, তারপর আমাদের কাজ আমরাই ঠিক ক'রে নেবো— তবে সে-দিনের দেরী নেই, সেদিন আসছে।"

সোমেশ আর দেরী করতে পারেনা, ট্রেনের সময় হয়েছে। বললে, "বাদলাকে আমি এখানে থাকতে বলেছি পরেশদা, সারাদিন তোমাদের কাজকর্ম্ম করবে—রাত্রে বাড়ীতে ওর দাদুর কাছে গিয়ে শোবে। হ্যাঁ, আর-একটা কথা।"

একবার বরুণার পানে তাকিয়ে আস্তে-আস্তে পকেট হতে একগোছা নোট বের ক'রে সে পরেশের চেয়ারের পাশে রেখে বললে, "আপত্তি করোনা, একটি কথা বলোনা, টাকাগুলো এখন থাক তোমার কাছে। এ-থেকে ধার হিসেবে নাহয় নিয়ো যা দরকার পড়বে।"

"টাকা?" পরেশ হাসবার চেষ্টা করে—"অভাব আছে বইকি। হয়তো বাধ্য হয়েই টাকা নিতে হবে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এ-টাকা কোথা হতে এলো? কুমুদ, জিতেনদার অর্জ্জিত কি?"

সোমেশ একমুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "যা করেই

আসুক, আমাদের নিজের স্বার্থের জন্যে যে নয় সেকথা ঠিক। কিন্তু পরেশদা, একটা কথা মনে হয়, আজ আমরা কি-রকম ঠাণ্ডা হয়ে গেছি বলো তো? টাকাটা হাতে এলেও, কি-রকমভাবে এলো তা জিজ্ঞাসা করি। যদি আট-দশবছর আগে এ-রকম মনের ভাব থাকতো—আমরা সত্যিই সাধু হয়ে জীবন যাপন করতে পারতুম।"

পরেশ তাকায় অতীতের পানে।

আট-দশবছর আগের পরেশ, সোমেশ—

ট্রেন লুট, ধ্বংস, ট্রেজারী লুট, দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতি, হত্যা, বোম, রিভলভার, ছোরা, বন্দুক—

কিন্তু সেদিন আজ অতীতে মিশে গেছে, সে-পরেশ মরে গে[illegible]। এ-পরেশ তার ছায়ামাত্র।

আঠারো

সুজিতের বোন, দীপান্বিতা।

সোমেশ জেল হতে বার হয়ে যখন পিসীমার কাছে দুদিন ছিল, তখন সে এখানে ছিলনা, বোর্ডিংয়ে ছিল।

বাড়ীতে থেকে পড়াশোনা চলতে পারবে না ব'লে সুজিতই জোর ক'রে তাকে বোর্ডিংয়ে দিয়েছিল।

অনুপমা মাসখানেক হলো তীর্থ-ভ্রমণে গেছেন, সুজিত একাই বাড়ীতে থাকে।

চিরবাঞ্ছিতা

কাছেই মেয়েদের হোস্টেল, দীপান্বিতা প্রায়ই এসে দাদার ছোট সংসারটা দেখা-শোনা ক'রে, খাওয়ার তত্ত্বাবধান ক'রে যায়। শনিবারে সে আসে, রবিবার এ-বাড়ীতে থাকে। এই দুদিন কিন্তু সুজিতকে ঠিক ঘড়ি ধ'রে নাওয়া-খাওয়া করতে হয়, এতটুকু ব্যতিক্রম হওয়ার যো থাকেনা।

সোমেশ এই প্রথম দেখলে, দীপান্বিতাকে।

অত্যন্ত সাদাসিধে মেয়ে, আড়ম্বর তার কোনো দিক দিয়ে নেই। সুন্দরী সে নয়, শ্যামল বর্ণ—চোখ-মুখেও বিশেষ বুদ্ধিমত্তার ছাপ নেই। স্কটিশচার্চ্চ-কলেজে বি-এ পড়ে, কোনোরকমে হয়তো পাসমার্কটা রাখতে পারবে।

সোমেশদা এসেছে খবরটা হোস্টেলে পাওয়ামাত্র কয়েক-দিনের ছুটি নিয়ে দীপান্বিতা বাড়ীতে এসে উঠলো।

"ওমা, তুমিই বুঝি আমার সোমেশদা! বাবাঃ, তোমার কতো গল্পই যে শুনেছি দাদার কাছে আর জ্যেঠাইমার কাছে! ওঁরা তো তোমায় একেবারে 'সব্যসাচী' ঠিক ক'রে ফেলেছেন। আচ্ছা, সত্যি বলো তো সোমেশদা, তোমরা নাকি অনেক কাজ করেছিলে, যার জন্যে জেল হতে খালাস পেলেও, আজও নাকি টিকটিকি ঘোরে তোমাদের পেছনে-পেছনে?"

সুজিত ধমকের সুরে বলে, "আঃ, কি বক্‌বক্ করছিস দীপা? তোর বকুনির চোটে দেখছি শেষপর্য্যন্ত সোমেশকে পালাতে হবে বাড়ী ছেড়ে।"

দীপান্বিতা এক-কথায় যেন নিবে যায়।

একটু অভিমানের সুরই তার কণ্ঠে ভেসে ওঠে, "তবে থাক্‌না বাপু, তোমায় আর কোনো কথা বলবো না যদি বাড়ী ছেড়ে পালাও—শেষপর্য্যন্ত চিরকালের জন্যে আমার নামে একটা দোষই থেকে যাবে।"

সোমেশ একটু হেসে বললে, "শোনো কেন সুজিতের কথা! তোমায় রাগাবার জন্যে ও যা-তা বলছে। তুমি যা জিজ্ঞাসা করবার তা করো দীপা, আমি সব-কথারই উত্তর দেবো। সুজিত দুদিন বিলেত ঘুরে এসেছে কিনা, তাই নিজেকে একটা কেষ্ট-বিষ্টু মনে করে—যাকে যা-না বলবার তাই ব'লে বসে। ওর এখন বিবেচনা করা উচিত, তুমি রীতিমত সাবালিকা, বি-এ পড়ছো. কাজেই, ছেলেমানুষের মতন বক্‌বক্ করতে তুমি পারোনা।"

দীপা ভারি খুশী হয়ে যায়—"শোনো তুমি, একবার শোনো দাদা। চিরদিন আমায় ছেলেমানুষ বলেই তো উড়িয়ে দিয়ে আসছো বড়ো ব'লে ভাবতে পারোনি। জানো, সোমেশদা, জ্যেঠাইমা বৃন্দাবনে যাওয়ার পরেই আমাদের নতুন বামুন পালিয়ে গেল, দাদা খেতে পায়না। বললুম, আমি বাড়ীতে এসে থাকি, যাহয় দুটো রান্না ক'রে দেবো—"

"তুই রান্না করবি?" সুজিত উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে ওঠে—"রাঁধতে জানিস তুই কখনো? কতোখানি জল দিয়ে ভাত রাঁধতে হয়, আর তেল কতোটা গরম হ'লে মাছ ছাড়তে হয় সেই টেম্পারেচারটা জানতে হলে তো নিয়ে আসবি থার্মোমিটারটা!"

দীপান্বিতার মুখখানা লাল হয়ে ওঠে, সবেগে সে বলে, "হ্যাঁ, তাই বইকি। আমি তো কখনো রাঁধিনি কিনা! কতোদিন পিকনিক করতে গিয়ে আমি যা রেঁধেছি, সকলেই খেয়ে প্রশংসা করেছে। এইতো এখানে এসেছি ? দেখো, রেঁধে যখন খাওয়াবো তখন আর ভুলতে হবেনা।"

দুই ভাইবোনের এই ঝগড়াটা সোমেশ বেশ কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করছিল। এতক্ষণে সে কথা বললে, "বেশ তো, কাল রেঁধে খাওয়ালেই চলবে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে। তা নিয়ে অনর্থক আর ঝগড়া-বিবাদ ক'রে লাভ কি? এখন থাক্ দীপা, আজকের দিনটা যখন আছি, তখন রাত্রে গল্প করা যাবে'খন।"

খুশী হয়ে দীপান্বিতা খাওয়ার তদারকে চ'লে যায়।

সুজিত হেসে বলে, "এমন ছেলেমানুষ আমি আর দুটি দেখিনি। তাইতো আমার বড়ো ভাবনা হয় ওর জন্যে—এরপর কি হবে, কে ওকে দেখবে! বিয়ের কথা বললে এমন রুখে উঠবে যে, আমাকেই চুপ ক'রে যেতে হয়।"

সোমেশ বললে, "থাক্না। বিয়ে যে করতেই হবে তারই-বা কি মানে আছে? জগতে সব-মেয়েই যদি বিয়ে করে, কাজ করবে কে? এক-আধটা ব্যতিক্রম রইলোই-বা। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবেনা।"

সুজিত এরপর অন্য কথা পাড়ে, বলে, "তারপর? তোমার ওদিককার খবর কি সোমেশ? পরেশদা কেমন আছেন?

সেবার যাবার কথা বললুম, পত্র এলো—এখানে এখন আসা হবেনা। শেষে জানলুম, একজন সি-আই-ডি সর্ব্বদা ওই মরা-মানুষটার খবরদারীতে রয়েছে। তখন বুঝলুম, পাছে কোনো বিপদে জড়িয়ে পড়ি এইজন্যেই এই নিষেধাজ্ঞা প্রচার হয়েছে।”

সোমেশ বললে, “সত্যিই ভাই। এরমধ্যে আরও ব্যাপার ঘটে গেছে যে। বিশেষ ক'রে তাতেই আরও খবরদারী চলছে। এককালে পরেশদার ডানহাত ছিল সত্যবান আর মজিদ,— দু'জনেই জেল হতে পালিয়ে বহুদিন ধ'রে নাম বদ্‌লে আত্মগোপন ক'রে বেড়াচ্ছিলো। তারা নাকি ওখানকার মিলে কাজ নিয়েছিল, ষ্ট্রাইক করতে গিয়ে ওদের আসল পরিচয় পুলিস জানতে পারে, তখন আবার তারা পালায়। পালানোর আগে তারা এসেছিল আবার দল বাঁধবার উদ্দেশে শুধু আমার কাছেই নয়, পরেশদার কাছেও। পরেশদা তাদের শেষ জবাব দিয়েছেন, আর তারাও আমাদের শাসিয়ে গেছে—দেখে নেবে। তোমার সন্ধানও তারা জানে, সেইজন্যে তোমাকেও সাবধান করছি সুজিত, সহজে তারা ছাড়বে না কাউকে।”

সুজিত হেসে ওঠে—“অমূলক ভয় সোমেশ। আর যারই হোক তোমার ভয় মানায় না। আমি নিজের জন্যে বিন্দুমাত্র ভয় করিনা, নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে আমি জানি। সি-আই-ডি অনেক-দিনই আমার সঙ্গে আছে, দোষ পেলে তবে ধরবে। কেবলমাত্র দেশসেবা-অপরাধে তারা ধরতে পারেনা। আজকাল দেশসেবক

নয় কে ? নিজেদের দুর্গতি বুঝতে পারছে না কে ? মনে-প্রাণে স্বাধীনতা চাইছে না কে ? মজিদ আর সত্যবান আজ কোথায় ভেসে গেছে, আছে কি নেই তা আমি জানিনা, তবু আমি ঠিক পরেশদার মতে মত মেলাতে পারছি না। কোনোদিন মতের মিল না হলেও আমি পরেশদাকে শ্রদ্ধা করি—ভালোবাসি। মত কোনোদিনই আমাদের মিলবে না, তাই ব'লে আমার মনের সিংহাসন হতে তিনি কোনোদিনই বিচ্যুত হবেন না।"

সুজিত অন্যমনস্কভাবে একখানা বইয়ের পাতা ওল্টায়।

"আজ কিন্তু আমায় একবার ছেড়ে দিতে হবে সোমেশ, আমাদের একটা মিটিং আছে, সেখানে আমায় উপস্থিত হতেই হবে। তোমায় নিয়ে যেতে পারতুম, কিন্তু আজ থাক্, যদি তুমি এখানে থাকো, সামনেরটায় তোমায় নিয়ে যাবো।"

সোমেশ বললে, "আজই-বা থাকবে কে। আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখি, তোমরা আবার নতুন ক'রে কোন্ অভিযানের পথে অগ্রসর হচ্ছো।"

সুজিত বললে, "আজ থাক্ সোমেশ, আজ আমাদের বিশেষ অধিবেশন। মেম্বররা ছাড়া আর-কেউ থাকতে পারবে না, আর আমাদের পার্টির মেম্বরের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। তোমায় আমাদের পার্টির নিয়মাবলী জানাবো, তারপর যদি তোমার ইচ্ছে হয় তুমি আমাদের পার্টিতে যোগ দিতে পারবে—তখন অনায়াসে তুমি যেতে পারবে।"

তারপরেই সে হেসে বলে, "এদের আবার কতকগুলো সর্ত

আছে কিনা, তারই জন্যে আমাদের বাইরের লোক এর কোনো অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেনা। উদ্দেশ্য হয়তো তোমারও যা আমারও তাই, তবু পথ আলাদা কিনা, পার্টির মেম্বর ছাড়া আর-কাউকে সেইজন্যে ওখানে নিয়ে যাওয়া নিষেধ।"

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ক'রে সে বিদায় নিলে।

দীপান্বিতা রাগ ক'রে বলে, "দাদার কোনো আক্কেল নেই সোমেশদা। তুমি যেই এলে, অমনি দাদা বাড়ী ছেড়ে গেল একেবারে আজকের মতন। দেখো না, আজ ফিরলে হয়। এই নিয়েই তো পিসীমার সঙ্গে ঝগড়া বাধে। পিসীমা বলেন, বিয়ে-থা' ক'রে সংসার পেতে বোস্, আমি নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু দাদা সেকথা হেসে উড়িয়ে দেয়। সেইজন্যেই তো পিসীমা রাগ ক'রে চ'লে গেছেন। বলেছেন, এখানে আর তিনি আসবেন না।"

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দীপান্বিতা বসে সোমেশের কাছে গল্প শুনতে।

"জানো, সোমেশদা, তোমার গল্প আমাদের বনানী দাস বলেছে। বনানী দাসকে চেনোনা? তোমাদের ওখানকার জমিদারের মেয়ে। ওর এক দাদা শুভদাস—হাকিম, আর-এক দাদা বিভূদাস—পুলিসের সি-আই-ডিতে কাজ করে।"

সোমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—"চিনি।"

দীপান্বিতা বললে, "বনানী বলে, তোমরা নাকি আগে কতো কাজই করেছো। এককালে চলন্ত-ট্রেন হতে ডাকাতি ক'রে

লাফিয়ে প'ড়েছো, ডিনামাইট দিয়ে কতো ট্রেন উড়িয়েছো, কতো খুন করেছো রাহাজানি করেছো। আচ্ছা, সত্যি এসব করেছো তোমরা সোমেশদা ?"

সোমেশ জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি একথা বিশ্বাস করেছো দীপা ?"

দীপা বললে, "সত্যিকথা বলবো—এতদিন তো তোমায় দেখিনি, তাই তোমার সম্বন্ধে সব-কথা বিশ্বাসও করেছি। তোমাদের দলটার কথা মনে হ'লে আমি কখনো মানুষ ব'লে তোমাদের ভাবতে পারতুম না।"

"জলজ্যান্ত রাক্ষস কি দৈত্য ব'লে ভাবতে দীপা, না ?"

সোমেশ অত্যন্ত খুশী-মনে হাসতে থাকে।

দীপান্বিতা বলে, "প্রায়। তোমাদের খুনে ঘাতক ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারিনি সোমেশদা।"

সোমেশ জিজ্ঞাসা করলে, "দেখে এখন কি মনে করছো ?"

সরল শিশুর মতই দীপান্বিতা বললে, "এখন দেখছি তুমি আমাদেরই মতন একজন। তোমার মুখ দেখে মনে হয়না যে, তুমি ওসব কাজ করতে পারো।"

সোমেশ বললে, "না দীপা, সত্যিই আমি ছ-বছর কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে জেল খেটেছি। তবে, একদিন আমি যা ছিলুম আজ অবশ্য তা নই, এখন আমি ওসব কথা মনে করতেও শিউরে উঠি। তবে, হ্যাঁ। এ-কথা এখনও বলবো দীপা, তারও প্রয়োজন ছিল। শাসক-সম্প্রদায়কে জানিয়ে

দেওয়া দরকার ছিল যে, আমরা কেবল ফোঁস করতেই পারিনা, ছোবল মারতেও পারি, বিষ ঢেলে দিতেও পারি। আজ অনেক-সময় ভাবি—আমাদের কি সত্যিই মৃত্যু হয়েছে ?”

সে চুপ ক'রে যায়। তার মুখখানা করুণ হয়ে ওঠে। দীপান্বিতা আশ্চর্য্য হয়ে তার পানে তাকিয়ে থাকে। তারপর অনেকক্ষণ কেটে যায়, সোমেশের ধ্যান ভাঙাতে দীপান্বিতার সাহস হয়না।

উনিশ

“ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—”

ফোনে কে ডাকে।

সোমেশ ফোন ধরলে—“হ্যালো ? কে ? হ্যাঁ। আমি ডক্টর সুজিত রায়ের বাড়ী হতে কথা বলছি। আমি সোমেশ,—সুজিতের বন্ধু।···আমাকে ওখানে যেতে হবে···বিশেষ দরকার ? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।”

সে ফোন ছেড়ে দিলে।

পাংশুমুখে দীপান্বিতা জিজ্ঞাসা করলে, “কে ডাকছে সোমেশদা ? কোথায় যেতে হবে—কি দরকার ?”

সোমেশ বললে, “তেরো নম্বর সার্পেণ্টাইন লেন হতে ফোন করছে—সুজিতের জন্তেই ডাকছে, কি বিশেষ দরকার আছে। তাহ'লে আমি চললুম দীপা, দেরী করলে হবেনা।”

"আমি তোমার সঙ্গে যাবো সোমেশদা—আমায় নিয়ে চলো। নিশ্চয়ই দাদার কোনো বিপদ হয়েছে, আমার মন বলছে।"

দীপান্বিতার চোখ দুটি সজল হয়ে উঠলো, রুদ্ধকণ্ঠে সে বললে, "দুটো ভাত পর্য্যন্ত খেয়ে গেলনা। আজ ক'দিন জ্বরের মতন হয়েছিল, আজ ভাত খাবার কথা বললুম—শুনলে না। দশ-বারোদিন আগে আসানসোল হ'তে ফিরে পর্য্যন্ত দাদা ভয়ানক অন্যমনস্ক রয়েছে সোমেশদা। কাল সন্ধ্যেবেলায় কে একটি মেয়ে এসে একখানা পত্র দিয়ে গেল, সেই পত্রখানা পেয়ে পর্য্যন্ত দাদা সমস্ত রাত জেগে কাটিয়েছে। দাদার নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে—নিশ্চয়ই।"

বলতে-বলতে সোমেশের একখানা হাত চেপে ধ'রে সে বালিকার মতন হু-হু ক'রে কেঁদে ফেললে।

সোমেশ বললে, "না, না, যা-তা ভেবোনা। দীপা, আমি বলছি তোমার দাদার কিচ্ছু হয়নি, সে ভালোই আছে। যেতে চাও তুমি—চলো, তবে, একে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, তার ওপর ব্ল্যাক-আউটের রাত আর সার্পেন্টাইন লেনের মতন গলি, সেখানে—"

দীপান্বিতা চোখ মুছতে-মুছতে বললে, "তা হোক, আমি যাবো, তুমি দেখো সোমেশদা, আমার কিচ্ছু হবেনা। বিশেষ তুমি তো সঙ্গেই থাকবে।"

সন্ধ্যার অন্ধকার বাইরে জমাট বেধেছে। এই জমাট-অন্ধকারের মধ্যে একখানা ট্যাক্সিতে দীপান্বিতাকে নিয়ে সোমেশ উঠে বসলো।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দীপান্বিতা বললে, "বনানী ঠিক এইকথাই বলেছিল। বলেছিল, দাদার নাম সে দেখেছে, দাদাকে সাবধান করতে বলেছিল। দাদাকে আমি এ-কথা বলেছিলুম, কিন্তু দাদা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।"

খানিক চুপ ক'রে থেকে সে আবার বললে, "আচ্ছা সোমেশদা, তুমিই বলো, দাদা কি সত্যিই ওই অ্যানার্কিষ্ট-দলে যোগ দিয়েছে? আমি কিন্তু ওদের ভয়ানক ভয় করি, ঘৃণাও করি। কোনোদিন ওদের ছুচক্ষে দেখতে পারিনি। দাদাও তো তা জানে। আমার মনে হয়, বনানী আমায় ভয় দেখানোর জন্যেই এ-কথা বলেছে, আর তুমি দাদার বন্ধু জেনে তোমার কথাও অতিরঞ্জিত ক'রে বলেছে।"

সোমেশ বললে, "একদিন ছিল বটে দীপা, যেদিন আমাদের ওইসব কাজের দরকারও হয়েছিল, কিন্তু আজকাল এ-সবের দরকার দেখছিনা, দেখছি আগে আমাদের ঘরের দিক। যাদের নিয়ে বিরাট সঙ্ঘশক্তি গ'ড়ে উঠবে, তাদের সেদিন আমরা বাদ দিয়েছিলুম। আজ কিন্তু জাগাতে চাচ্ছি তাদের। দেখছি, গণ-চেতনা ছাড়া আর কিছুই হবেনা। আজ এর জন্যে যা করবার তাই আমরা করবো, আর-কিছু দেখবো না। আমি ভাবছি, তোমার বনানী যে আমাদের জন্যে বড়ো বেশীরকম ভাবছে, তার মানে কি? আমাদের সতর্ক ক'রে দেওয়ার কি স্বার্থ আছে তার!"

দীপান্বিতা বললে, "তুমি বনানীকে চেনোনা সোমেশদা। বাইরে থেকে দেখে তাকে এতটুকু বিচার করতে পারোনা। কিন্তু,

ভেতরে সে যে কত বড়ো তা আমি তোমাকে ব'লে বোঝাতে পারবো না। যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়, তুমি তাকে হয়তো চিনতে পারবে না, কিন্তু চিনতে না পারার জন্যে তাকে তুমি অপরাধিনী করতে পারবে না। তার অন্তরটাকে চেনবার চেষ্টা ক'রো, যেন ভুল করোনা।"

সার্পেণ্টাইন লেনের সামনে ট্যাক্সী থেমে গেল। যে-পথটার নির্দ্দেশ সোমেশ দিয়েছিল সে-পথ এত সরু, যাতে গাড়ী যায়না।

সোমেশ টর্চ্চ এনেছিল, সেই আলো ফেলে খানিক দূর যেতেই পাওয়া গেল নির্দ্দিষ্ট নম্বরের বাড়ীখানা।

একটা বেশ বড়ো বস্তী। হয়তো অনেক লোকই এখানে বাস করে।

পথের ওপরে ছোট নীচু দরজা, লম্বা-কেউ প্রবেশ করতে গেলে দরজা তাদের মাথায় ঠেকবে।

দরজার সামনের কড়া ধ'রে সোমেশ দু-একবার নাড়ার পরে ভেতর হ'তে সাড়া পাওয়া গেল, "থামুন, যাচ্ছি।"

ভেতর হ'তে দরজা খুলে দিয়ে যে স'রে দাঁড়ালো সে একটি মেয়ে।

"আসুন।"

সোমেশ প্রশ্ন করলে, "আপনিই আমায় ফোন করেছেন?"

মেয়েটিকে দেখা যায়না, তার কথা শোনা যায়—

"হ্যাঁ। আমিই সুজিতবাবুর নির্দ্দেশমত ফোন করেছি। আপনিই তো সোমেশবাবু, তাঁর বন্ধু! আর, ইনি?"

সোমেশ উত্তর দিলে, "আমি সোমেশ, আর ইনি সুজিত রায়ের ভগ্নি, দীপান্বিতা রায়।"

মেয়েটি পথ দেখিয়ে চললো, পেছনে চললো, সোমেশ ও দীপান্বিতা।

চাপা ভ্যাপসা-গন্ধ নাকে আসে, দীপান্বিতা রুমালে নাক চাপা দেয়। এই বিশ্রী-গন্ধ সে সইতে পারেনা। চারিদিকে জমাটবাঁধা ঠাণ্ডা অন্ধকার···মনে হয় সামনে কে যেন বাধা দিচ্ছে এগিয়ে যেতে। পদে-পদে দীপান্বিতা হোঁচট খায়, সোমেশ তার হাত ধ'রে সন্তর্পণে চলে, বলে, "আস্তে হাঁটো দীপা, ঠিক আমার সঙ্গে-সঙ্গে এসো, প'ড়ে যেয়োনা যেন।"

সামনের মেয়েটি চলতে-চলতে থামে, বলে, "লণ্ঠনটা ঘরে আছে, বাইরে আনতে পারিনি অনেক কারণে, আসুন, এইদিকে।"

অন্ধকারে একটা ঘরের ভেজানো-দরজার ফাঁক দিয়ে এতটুকু আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে, মেয়েটি সেই ঘরের দরজা খুলে বললে, "এই ঘরে আসুন।"

ঘরের একপাশে কে শুয়ে আছে আগাগোড়া একখানা চাদর চাপা দিয়ে, এদিকে একখানা সতরঞ্চি পাতা, পথ-প্রদর্শিকা মেয়েটি সেই সতরঞ্চিতে বসতে অনুরোধ করলে।

সোমেশ বসলো না, জিজ্ঞাসা করলে, "আমি জানিনা আমায় এখানে ডাকবার কারণ কি। সুজিত কোথায়, তার কথাটা আগে জানতে পারলে আমরা বাধিত হবো। তার জন্যে আমরা ভারি

ভাবনায় পড়েছি, সেইজন্যে আগেই তার কথাটা জানতে চাচ্ছি এজন্যে মাপ করবেন।"

মেয়েটি সোমেশের পানে চাইলে, স্থিরকণ্ঠে বললে, "আপনি নিঃসন্দেহে বলুন, আমি মিঃ রায়ের নির্দ্দেশমতই আপনাকে ফোন করেছি। আমার নিজের যাবার উপায় নেই, তবু কাল আমি আমাদের পার্টির নির্দ্দেশমত তাঁর কাছে গিয়েছিলুম।"

দীপান্বিতা জিজ্ঞাসা করলে, "আপনিই কাল গিয়েছিলেন, কালো একখানা কাপড়ে আগাগোড়া ঢেকে—সে কি আপনিই?"

মেয়েটি উত্তর দিলে, "হ্যাঁ। সে আমিই। আজ আমাদের পার্টির বিশেষ অধিবেশন ছিল দুপুরে, কিন্তু পুলিস আগে হ'তে সন্ধান পেয়েছিল আর সেখানে গিয়ে রীতিমত হানা দিয়েছিল। সেখানে গুলিও চলেছিল সেইসময়।"

"কিন্তু দাদা—আমার দাদা—দাদা কোথায়?"

দীপান্বিতা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

শান্তা আবার হাসে, বলে, "আপনার দাদা ভালোই আছেন, তবে তিনি এখানে নেই। আমার কথাটা আগে শুনলে বুঝবেন, ব্যাপারটা কি হয়েছে।

আজ মিটিং ছিল বড়বাজারের কোনো-একটা অন্ধ-গলির মধ্যে, সেইখানে হানা দিয়েছিল পুলিস। উপস্থিত যারা ছিল তারা প্রায় সবাই ধরা পড়েছে, দু-তিনজন মাত্র যারা পালাতে পেরেছে, সুজিত ছিল তাদেরই মধ্যে একজন।"

শান্তা যখন ফোন করেছে, সুজিত তখনও এখানে উপস্থিত

ছিল। সে ভেবেছিল, সোমেশের সঙ্গে দেখা ক'রে সে কিছু ব'লে যাবে, কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। বৈকালের শেষে সন্ধ্যার প্রারম্ভে সে এখানে এসেছিল, তাড়াতাড়ি একখানা পত্র লিখে রেখে গেছে, আর কতকগুলো কাগজপত্র দিয়ে গেছে। পত্রখানা দীপান্বিতাকে দিতে হবে, আর কাগজপত্রগুলো সোমেশের হাতে পৌঁছে দিতে হবে, শান্তার ওপর এই নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। হয়তো সে আরও খানিকক্ষণ থাকতে পারতো, কিন্তু এখানেও পুলিস অনুসরণ ক'রে আসছে শুনে সন্ধ্যার অন্ধকারে ব্ল্যাক-আউটের সহায়তায় সে স'রে পড়েছে।

ব্যগ্রকণ্ঠে দীপান্বিতা জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় গেল ?"

শান্তা বললে, "আপনার পত্রে তিনি তা লিখে রেখে গেছেন, প'ড়ে দেখুন।"

দীপান্বিতা পত্রখানা নিয়ে সত্বরক্ষিতে ব'সে লণ্ঠনের আলোয় পড়লে :

"কল্যাণীয়া দীপা,

আমায় চ'লে যেতে হ'চ্ছে, যাবার সময় তোকে সব-কথাই জানিয়ে যাচ্ছি। জানিনা আর কোনোদিন তোর কাছে ফিরতে পারবো কিনা, তোর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে কিনা। কিন্তু দেখা যদি নাই হয়, তাতেই বা দুঃখ কিসের বোন। একদিন তো দেখা হবেই। যতদিন শাসকের হাতে শাসন-যন্ত্র আছে ততদিন আমার ফেরার আশা নেই, যদি কোনোদিন দেশ স্বাধীন হয় সেইদিনে তোর দাদা আবার তোর কাছে ফিরে

আসবে, সেইদিনের তপস্যা এখন হ'তে তোরাই করিস। ভারতের মেয়েদের একাগ্র-সাধনায় আমাদের মুক্তি এগিয়ে আসুক, তারাই আমাদের সত্যকার পথ নির্দ্দেশ করুক।

আজকের গুরুতর দায়ীত্বভার অর্পিত হতো আমাদের প্রেসিডেন্ট, বরুণাদির ওপরে। কিন্তু আজকের দিনের ভয়াবহতা আর পরেশদার বর্ত্তমান অবস্থা মনে ক'রে আমিই প্রেসিডেন্টের স্থলে—আজ কাজ করেছি। আমি আজ নরহত্যা করেছি বোন, হয়তো সেই কনেষ্টবল-বেচারা আমার গুলিতে মারা গেছে। তাকে মারবার ইচ্ছে আমার ছিলনা, আমি চেয়েছিলুন, বাঙালীর কলঙ্ক বিভূদাসকে সরাতে, যে বিভূদাস তোরই বন্ধু—বনানীর সহোদর। এই লোকটা নিজের উন্নতির জন্যে এ পর্য্যন্ত কি কাজই না করেছে, এরপর সবই জানতে পারবি।

আজ চ'লে যেতে আমার কোনো ব্যথা হতোনা যদি তুই না থাকতিস। জ্যেঠাইমাকে পত্র দিস, আমি এখানে নেই। একথা জানলে তিনি যত শীগগির পারেন চ'লে আসবেন।

সোমেশকে বলিস, কাগজপত্র সব রেখে গেলুম, এসব যেন আমাদের প্রেসিডেন্টকে একবার দেখিয়ে নষ্ট ক'রে ফেলে। বরুণাদিকে আজ যেন বিপদে না পড়তে হয়, কারণ, তাঁরই ওপর পরেশদার জীবন নির্ভর করছে। আর তুই—তোকে কি সান্ত্বনা দেবো বোন? ছেলেমানুষির জন্যে কতোবার তোকে কতো ধমক দিয়েছি—কতো কথা বলেছি। আজ ক'দিন পরে দাদাকে খাওয়াবি ব'লে নিজের হাতে রান্না করেছিলি, কিন্তু কর্ত্তব্যের

ডাকে তোর হাতে খেয়ে আসতে পারিনি। জানিনা আর ফিরবো কিনা। তোরা সাধনা কর দিদি—কেবল আমাদের সাধনায় শক্তি জাগবে না, তোরা সাধনা কর, সেই সাধনায় দেশের মরা-শক্তি আবার জাগবে, তখন আমরা পলাতকের দল আবার স্বাধীন-ভারতে ফিরতে পারবো।

একটি ফোঁটাও চোখের জল ফেলিস নি—এই তোর দাদার একমাত্র অনুরোধ।

আমার ঘরে অনেক-কিছু কাগজপত্র এখনো আছে, সেইগুলো সব নষ্ট ক'রে ফেলিস। বিদায়।

তোর দাদা।"

দীপান্বিতা মুখ তুললে। তার দু'চোখে তখন জল ছিলনা, আগুন জ্বলছিল।

শান্তা ততক্ষণে কাগজপত্র সব সোমেশের হাতে দিয়েছে, তাকে সুজিত যা-যা ব'লে গেছে তা বলাও হয়ে গেছে।

পত্রখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে দীপান্বিতা দাঁড়ালো।

তার কঠিন মুখখানার পানে তাকিয়ে সোমেশ বুঝলে যে, সে একটা-কিছু করতে দৃঢ়সংকল্প করেছে। কথা না বাড়িয়ে সে শুধু বললে, "এসো দীপা, আমার কাজ সারা হয়ে গেছে।"

যখন তারা বিদায় নিলে, ঘরের পাশে বিছানায় যে শুয়েছিল সে তখন মুখের ঢাকন খুলেছে।

আজকেরই মিটিংয়ে পুলিসের গুলিতে আহত একটি তরুণ-

কিশোর, গুলি তার হাতে লেগেছে, একেই পৌঁছে দিতে এসেছিল সুজিত।

অন্ধকারের মধ্যেই সুরেশ, দীপান্বিতার হাত ধ'রে আবার অতি সন্তর্পণে ফিরে চললো। শান্তা আস্তে-আস্তে দরজা খুলে দিলে—ফিস্‌ফিস্ ক'রে কেবলমাত্র বললে, "নমস্কার।"

প্রতিনমস্কারের কথাটা শুধু সোমেশের মুখেই ফুটলো, দীপান্বিতার মুখে একটি কথাও শোনা গেলনা।

কুড়ি

পরেশ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে :

'আমি যে দেখেছি কপট হিংসা গোপন রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি যে শুনেছি প্রতিকার হীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সে ডাক দেয়—"শুনে যাও বরুণা, একটা কবিতা শুনে যাও। কি চমৎকার! সত্যি কি চমৎকার!

বরুণা ঘর হতে বার হয়ে আসে।

পরেশ তখনও প'ড়ে যাচ্ছে :

'আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে,
কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফলে মাথা কুটে।'

পরেশের চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে···হঠাৎ থেমে গিয়ে সে সজল-চোখের দৃষ্টি নীল-আকাশের পানে তুলে ধরে :

'কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফলে মাথা কুটে'

বার-বার সে এই একটা-লাইনই আবৃত্তি করে, তারপর তার চোখ নেমে আসে আবার ধরণীর ওপরে—"বরুণা!"

বরুণা তার মোড়ার পেছনে দাঁড়ায়। তার কেশবিরল মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে-বুলোতে বলে, "অত অস্থির হচ্ছো কেন, অমন অস্থিরতা তো তোমার মানায় না—ছি!"

আজ দিন-ছয়-সাত আগে পরেশের মুখ দিয়ে হঠাৎ এত রক্ত উঠেছিল, যাতে বরুণা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। মুখে সে যথেষ্ট সাহস দিলেও, অন্তরে সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দিনের পর দিন সে অহোরাত্র যে অনাগত-ভবিষ্যতের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চাচ্ছে, সেই ভবিষ্যৎ আজ এসে পড়েছে। আর যে সে-দিনকে ঠেকানো যাবেনা তা বরুণা জেনেছে।

আজ থেকে দিন-দশ-বারো আগেকার কথা।

হঠাৎই এসে পড়লো একদল পুলিস এবং তাদের মধ্যে দু-তিনজন অফিসার। এদের সঙ্গে ছিল—বিভূদাস। মাধব দাসের কনিষ্ঠপুত্র।

তারা এসেছিল, সার্চ্চের ওয়ারেণ্ট!

পরেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, বরুণা তাকে বুঝিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করেছিল—"সার্চ্চ করবেন ওঁরা করুন না, তাতে তোমার এতটা উত্তেজিত হবার কোনো দরকার নেই। তুমি ওঁদের নির্দ্দেশমত বাইরে বসবে চলো—আমি তো আছি, ভয় কি ?"

পুলিস, সার্চ্চের ওয়ারেণ্ট দেখিয়েছে। সম্প্রতি কলকাতায় বড়বাজারের রাজদ্রোহী একটা দলের গোপন মিটিং ছিল, সেখানে দু-তিনজন কনেষ্টবল নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়েছে। ডক্টর সুজিত রায় এবং আরও দুজন পলাতক, বাকি সকলকেই পুলিস ধরতে পেরেছে। এইখানেই সন্ধান পাওয়া গেছে পরেশ দাস এবং ওদের এক্স-প্রেসিডেণ্ট বরুণা দাসের। সেই সূত্র ধরেই পুলিস এসেছে।

শান্তকণ্ঠে বরুণা জিজ্ঞাসা করলে, "বডিওয়ারেণ্ট আছে কি ? গ্রেপ্তার করার কোনো নির্দ্দেশ পেয়েছেন আপনারা ?"

বিভূদাস উত্তর দিলে, "না। আপনারা বাইরে বসতে পারেন, তবে বাড়ীর বাইরে যেতে পাবেন না, ঘরের বাইরে বসুন।"

রুগ্ন পরেশকে নিয়ে বরুণা বারান্দার একপাশে এসে বসলো।

পুলিশ যথাইচ্ছা দুখানা ঘর আতি-পাতি ক'রে দেখলে, কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র, চাল-ডাল পর্য্যন্ত যথাইচ্ছা ছড়ালে, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেলনা।

সক্রোধে বিভূদাস বললে, "সব সরিয়ে ফেলেছে। এরা

মী-স্ত্রী দুজনেই একদিন আনা কন্ঠ-দলে ছিল, এখনও যে ই তার প্রমাণ পাওয়া যায়না। নিশ্চয় ঘরের মেঝে ড়লে অনেক-কিছু পাওয়া যাবে।”

নিস্তব্ধে স্বামী স্ত্রী তাকিয়ে দেখলে, সমস্ত ঘরের মেঝে বল দিয়ে খুঁড়ে ফেললে তারা, বেড়ার দেয়ালে ধাক্কা দিলে, টিগুলো নাড়লে, তবু কিছু পাওয়া গেলনা।

বিফলমনোরথ হয়ে তারা বিদায় নিলে।

বাদলা এ-বাড়ীতে আসবার সময়, পুলিস দেখে লম্বা ছুট য়েছিল, তারপর গ্রামপথে সজোরে মার্চ্চ ক'রে পুলিস-দল যখন লে গেল তখন তার দাদুকে নিয়ে ঢুকলো।

নিস্তব্ধে ব'সে আছে পরেশ। শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার রের দিকে। বকুল বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ব'সে কোন্ কে চেয়ে আছে কে জানে!

নিস্তব্ধে হারাধন ঘর দু-খানা দেখলে। বাদলা ফিসফিস্ 'রে বলছিল, “অনেক পুলিস এসেছিল দাদু। লালপাগড়ি থায়, এত বড়ো-বড়ো ভারি-ভারি জুতো পায়ে, তাদের দেখলে য় হয়।”

ক্ষুব্ধকণ্ঠে হারাধন বললে, “ওরা দুখানা ঘর এমন ক'রে ড়ো ক'রে দিয়ে গেল আপনার চোখের সামনে, আপনি দের কিছু বলতে পারলেন না, বাবু?”

পরেশ ক্ষীণ-চোখের দৃষ্টি হারাধনের ওপর রাখলে, মলিন কটু হাসির রেখা তার মুখে ফুটে উঠলো—“পুলিসকে কেউ

কোনোদিন বাধা দিতে পেরেছে হারাধন ? বিশেষ, আমাদের মতন যাদের নামের পেছনে ব্ল্যাক-স্পট আছে ?"

একটু থেমে সে আবার বললে, "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। যে একবার দাগী হয়েছে, সে হাজার সৎভাবে থাকলেও, তাকেই যে সবাই সব-রকমে অপরাধী করবে হারাধন! দোষ ওদের নয়, দোষ আমার। তাই জীবনের এই শেষমুহূর্ত্তে নিজের ঘরেও শান্তিতে শেষনিশ্বাস ফেলবার অধিকার পেলুম না।"

হারাধন ক্ষণকাল নিস্তব্ধে রইলো, তারপর বললে, "ও-বাড়ীতে চলুন, এ বাড়ীর জিনিসপত্র যা-কিছু আমি আর বাদলা নিয়ে যাবো-এখন।"

পরেশ মাথা নাড়ে—"না।"

হারাধন আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে বলে, "না, কেন ?"

পরেশ আবার হাসে, "আমি এইঘরেই থাকবো হারাধন, এ-ঘর ছেড়ে আমি কোথাও যাবোনা।"

হারাধন ছাড়েনা—"কি বলছেন বাবু, এইঘরে আমি আপনাদের রাখতে পারি কখনো ? খোকাবাবু এসে শুনলে আমায় কি বলবেন বলুন তো ? মেঝেটা একেবারে লাঙ্গল দেওয়ার মতন ক'রে চষে ফেলেছে, ওর মধ্যে সাপ লুকিয়ে থাকাটাও তো আশ্চর্য্য নয়! কখন ছোবল্ দেবে তার ঠিক কি ? বউমা, তুমি বাপু আমার কথা শোনো, ও-বাড়ীতে চলো। এরপর এ-ঘর ঠিক ক'রে নিয়ে তখন এসো এখানে।"

এরপর বাধ্য হয়েই আবার যেতে হলো সোমেশের বাড়ীতে।

জিনিসপত্র যা-কিছু ছিল, হারাধন আর বাদল দুজনে মিলে নিজেদের বাড়ীতে বয়ে নিয়ে গেছে।

বৎসর-খানেকের বাসস্থান, মায়া বিশেষ হয়নি, তবু মমতা খানিকটা পড়েছিল বইকি। বরুণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই হেসেছিল—মায়া আর মমতা! যার জন্মে সব, সেই তো আজ চ'লে যাওয়ার পথে। সে চ'লে গেলে এ-বাসস্থানে থাকতো কে—বরুণা?

এ-বাড়ীতে এসেই পরেশের মুখ দিয়ে অসম্ভব-রকম রক্ত উঠেছে। শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে পরেশ। জ্বরটাও বেশ বেড়েছে, কাশির সঙ্গে রক্তও উঠছে।

বরুণার মুখে চিন্তার ছায়া পড়েছে।

দিন এসেছে··· দিন এসেছে···

বরুণা যেদিনের ভয় করছিল সেদিন এসেছে।

কলোনীর ডাক্তারকে ডাকতে সে হারাধনকে পাঠিয়েছিল, শুষ্কমুখে ফিরে এলো সে।

"হলোনা বউমা, ডাক্তার আসতে পারবে না—তার অনেক কাজ। বাইরের 'কল' নেওয়ার নাকি সময় নেই।"

পরেশ শুষ্কহাসি হাসলে, বললে, "হবেনা বরুণা, কিছুই হবেনা। ডাক্তার যে আসবে না, সে-কথা আমি যেমন জানি, তুমিও তেমনি জানো। অনর্থক তবু যেচে কেন অপমান সইতে গেলে। এখানকার শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে যেদিন আমি কথা বলেছি, সেইদিন হতে মাধবকাকা আমার বিরুদ্ধে

প্রকাশ্যভাবে না হোক, অপ্রকাশ্যভাবে দাঁড়িয়েছেন। তুমি আজও কি তাঁকে চিনতে পারোনি বরুণা ?"

শান্তকণ্ঠে বরুণা বললে, "তুমি চেনবার আগে আমি ওঁকে চিনেছি। আমাদের সাহায্য করা, দেখা-শোনা করা, এ-সবের মূলে কি ছিল তা আমি জানি। কিন্তু, তুমি এ-সম্বন্ধে কোনো কথা কানে নিতে চাওনি তো। বরং, কোনো কথা বলতে গেলে বরাবরই উড়িয়ে দিয়েছো। আজ মাধবকাকার কাজ ফুরিয়েছে, তাই তিনি স'রে গেছেন। যাই হোক, তুমি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই আমি তোমায় নিয়ে আর-কোথাও চ'লে যাবো—পৃথিবীতে জায়গার অভাব নেই।"

"অন্য-কোথাও ?"

পরেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।"

"আর-কোথাও তো আমাদের জায়গা হবে না, বরুণা। যেখানেই যাবো, এমনি অত্যাচার-লাঞ্ছনা, এমনি অবিচার তো আমাদের সইতেই হবে! গ্রামের লোক হয়ে যেখানে গ্রামের লোকের সহানুভূতি পেলুম না—ভিন্ন জায়গায় গিয়ে তা পাবো কি ? দরকার নেই। আমার জন্যে 'কাল' যে সুধাপাত্র ভ'রে মুখের কাছে ধরেছে, আমি সে-সুধাপান করবোই, আর তাকে ফেরাবো না। জানো বরুণা, সেদিন আমি থাকবো না, তবু তোমরা আমায় মনে কোরো, তোমাদের সেই মনে করাটাই হবে আমার আত্মার মুক্তি। ভারতের সাধনা যতদিন না সার্থক হবে, আমি থাকবো তোমাদেরই কাছে বরুণা, তার আগে আমি কোথাও যেতে পারবো না যে!"

দুর্ব্বল-হাতে সে বরুণার হাতখানা ধ'রে প'ড়ে থাকে।

হারাধন খবর নিয়ে আসে, মিলের শ্রমিকরা ষ্ট্রাইক করেছে।

পরেশের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বরুণার হাতটা চেপে ধ'রে একটা মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে সে বলে, "শুনছো বরুণা? ওরা ষ্ট্রাইক করেছে। বাঁচার জন্যে যুদ্ধ সুরু করেছে।"

বরুণা বললে, "শুনেছি। জনসাধারণ ক্ষুধার্ত—তারা উত্যক্ত হয়ে উঠেছে, তাদের অভাব না মিটলে তারা কি-ক'রে কাজ করবে? আজ যে, চেতনা তাদের মধ্যে জেগেছে। তারা আর পেটে না-খেয়ে ভূতের মতন কাজ ক'রে শুধু মালিককেই সমৃদ্ধ করবে না।"

পরেশ চুপ ক'রে থাকে, বরুণা তাকে বেশী কথা বলতে দেয়না।

বরুণাই নিজে ওষুধ নির্ব্বাচন ক'রে হোমিওপ্যাথী ওষুধ দিচ্ছে। এতদিন কবিরাজি চলছিল, আর সে কবিরাজীর ওপর ভরসা করতে পারেনা।

যে ক'টা দিন বেঁচে থাকে—

বরুণার ঠোঁট দু'খানা কেঁপে ওঠে—হ্যাঁ, কর্ত্তব্য পালন তাকে করতেই হবে। কর্ত্তব্য পালনে সে এতটুকু অবহেলা করবে না। দেশসেবার ব্রত সে নিয়েছে বটে, কিন্তু এ-মন্ত্র তাকে দিয়েছে তার স্বামী, তাই দেশসেবা রেখে সে এখন একনিষ্ঠচিত্তে স্বামী-সেবা ক'রে চলেছে।

পরেশকে অন্যমনস্ক রাখতে সে সোমেশের আলমারি খুলে

অনেক বই বের ক'রে দিয়েছে, সময়-সময় নিজেও প'ড়িয়ে শোনায়।

পরেশ কম্পিতকণ্ঠে পড়ে :

'কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশী সঙ্গীত হারা।
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে ভুবন আমার দুঃস্বপনের জালে—
তাই তো তোমায় সুধাই অশ্রুজলে,
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ—
তুমি কি বেসেছো ভালো?'

বরুণা দাঁড়িয়ে থাকে, পরেশের পানে সে চোখ তুলে চাইতে পারেনা, পাছে চোখ ফেটে অবাধ্য-অশ্রু ছুটে বার হয়ে পড়ে।

একুশ

ছন্নছাড়া গ্রাম।

ওধারে মিল হয়ে গেছে নিস্তব্ধ, মিলের বাঁশী শোনা যায়না, চিমনি দিয়ে আর ধোঁয়া বার হয়না।

বরুণা পত্র দিয়েছে সোমেশকে—

"আর বেশী দেরী নেই ভাই। যদি দেখা করতে ইচ্ছে হয় তো যত শীগগির পারো চ'লে এসো।"

পত্র পেয়েই সোমেশ রওনা হয়েছে, আর মুহূর্ত্তমাত্র সে কলকাতায় থাকতে পারেনি। অনুপমা ফিরে এসেছেন, দীপান্বিতার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে সে ফিরেছে।

সোমেশ যে-ট্রেনে পৌঁছোলো, সেই ট্রেনেই ফার্ষ্টক্লাস কম্পার্টমেণ্ট হতে নামলেন, মাধব দাস। সঙ্গে তাঁর কন্যা-বনানী।

ছোট ষ্টেশনে সকলের ওপরেই দৃষ্টি পড়ে। সোমেশ পাশ কাটিয়ে বার হওয়ার মুহূর্তে মাধব দাসের দৃষ্টিপথে পড়্‌লো।

সদাহাস্যময়-মুখ মাধব দাস। সোমেশকে তিনি আট্‌কালেন—

"দাঁড়াও, দাঁড়াও সোমেশ, এত তাড়াতাড়ি এমনভাবে স'রে পড়ছো কোথায়? গাঁয়েই যাচ্ছো তো! আরে, আমরাও তো যাচ্ছি, নাহয় একসঙ্গেই যাওয়া যাবে, এত ব্যস্ততা কিসের?"

সোমেশ দাঁড়ালো। লোকটাকে অভিবাদন করবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হয়না, নেহাৎ ভদ্রতা রাখবার জন্যেই একখানা হাতের

আঙুল-ক'টা সে কপালে ছোঁয়ালে, উত্তর দিলে, "গাঁয়েই যাবো বটে, তবে আপনারা আসুন, আমি যাবো মাঠের পথ ধ'রে।"

মাধব দাস শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন, "কি দরকার মাঠের মধ্যে দিয়ে এই তিন-চার-মাইল হাঁটবার! আমার মোটর রয়েছে, মিনিট-পনেরো-কুড়ির মধ্যে গিয়ে পৌঁছে যাবো। হ্যাঁ, আমার মেয়ে বনানীর সঙ্গে আগে তোমার পরিচয় ক'রে দিই, বনানী স্কটিশচার্চ্চ-কলেজে ফোর্থ-ইয়ারে পড়ছে, এই সামনে ওর একজামিন এসেছে।"

সোমেশ নমস্কার করলে, স্মিতমুখেই বললে, "মিস দাস আমাকে আজ হয়তো চিনতে পারবেন না, কিন্তু আমি ওঁকে দেখেই চিনেছি। ছোটবেলায় অনেকবারই দেখেছি তো! আজ কলকাতায় থেকে অনেক বদলে গেলেও আমার ওঁকে চিনতে দেরী হয়নি।"

বনানীর মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে, জোর ক'রে মুখে সে হাসি ফুটিয়ে হাতখানা কপালে ঠেকাবার চেষ্টা করে।

সোমেশের চোখে এ-বনানী একেবারেই নতুন। প্রায় দশ-এগারো বছর সে ইলাকে দেখেনি। ছোটবেলায় গ্রামের মেয়ে যে-ইলাকে সে দেখেছিল—গ্রামের আর-পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে মিশে সেও করতো পুণ্যিপুকুর, গোকাল প্রভৃতি ব্রত—সেও করতো শিবপূজো। সোমেশ দেখতে পেতো তাকে—ছোট একটি মেয়ে, পথে দৌড়োদৌড়ি করতো, লুকিয়ে সোমেশকে দিয়ে যেতো গন্ধরাজ বেল যূইফুল, কোনোদিন-বা

তার এলোমেলো ঘরখানা লুকিয়ে গুছিয়ে দিয়ে পালাতো। সে-সব বাল্যস্মৃতি কি ভোলবার? সেই মেয়ে ইলা হয়েছে আজ বনানী—দর্পিতা একটি কিশোরী। আধুনিক-শিক্ষালব্ধ সভ্যতা তাকে অতিরিক্ত-রকম বিকৃত ক'রে তুলেছে। স্বভাবত শ্যামল-বর্ণকে সে প্রসাধনে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে, তার কৃত্রিম টানা ভ্রূ, সুরমা টেনে চোখকে দীর্ঘায়ত করবার প্রচেষ্টা—ওষ্ঠে ও গণ্ডের লাল আভা দেখে লোকে কে কি ভাববে তা সে কল্পনাও করেনা। মাথার চুলগুলোকে সযত্নে সে বব্‌ড্‌ করেছে, কাঁধ ছাড়িয়ে চুল নীচে নামতে পারেনি, অথচ একদিন মস্ত-বড়ো চুলের আগায় সে দিতো একটি শুভ্র গ্রন্থি, এবং সেইটিই তখন তাকে অতি সুন্দর ক'রে তুলতো।

সোমেশ অতি-আধুনিকতার এই উগ্রতা সইতে পারেনা। জীবনে সে যে-ক'টি মেয়ের সংস্রবে এসেছে, তারা চলেছে ত্যাগের পথ দিয়ে, ভোগকে জয় করেছে তাদের সংযম দিয়ে। সামনে সে দেখেছে, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা ত্যাগের পূর্ণমূর্ত্তি বরুণাকে, ত্যাগ দিয়ে সে ভোগকে জয় করেছে—স্বামীর জন্যে সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। সেকালের পুরাণ-বর্ণিত সতী-সীতা-সাবিত্রীর চেয়ে এ-মেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তার মায়ের সম্বন্ধে যা-কিছু শোনা গেছে তা সর্ব্বৈব মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন করতে সোমেশ সঙ্কুচিত হবেনা।

আর-একটি মেয়েকে সে দেখেছে—দীপান্বিতা রায়।

শিশুপ্রকৃতির মেয়ে সে। এককথায় সে যেমন উচ্ছ্বসিত

হয়ে হেসে ওঠে, তেমনি আবার এককথায় কেঁদে ফেলে। সুজিতের অদৃশ্য হওয়ার পর হতেই চঞ্চলা মেয়েটির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। আজকের দীপান্বিতা যেন সে-দীপান্বিতা নয়। কোনোদিন তার বসন-ভূষণে এতটুকু বাহুল্য সোমেশ দেখেনি, প্রসাধনকে ঘৃণা করেই সে এড়িয়ে যায়। এতদিন বাইরের মধ্যে বাস করেও বাইরের পরিচয় সে পায়নি, সুজিত তাকে নিজের বুকের আড়াল দিয়ে সন্তর্পণে সবল আঘাত হতে বাঁচিয়ে এসেছে। হঠাৎ সে এসে পড়েছে একেবারে সকলের মাঝে, বেদনাও পেয়েছে প্রচুর, কিন্তু সুজিত জানে, এই আঘাতের বেদনাই তাকে মানুষ করবে, তাকে যোগ্যতর স্থানে স্থাপিত করবে।

বনানীর দিকে তাকাতে সোমেশের [illegible] হয়না,—সে শুধু একটু হাসে। মাধব দাস একটু অন্তরঙ্গভাবে এগিয়ে যেতেই সে পাশ কাটিয়ে স'রে পড়ে।

অনেকদিন পরে সেই মাঠের পথ ভেঙে চললো সোমেশ। আজ সে চায়ের দোকানের পানে চেয়েও চাইলে না। বাঁচবার অধিকার আছে প্রত্যেক মানুষের। জীবিকার্জ্জনের জন্যে তারা যেমন করেই হোক পয়সা উপার্জ্জন করুক, লোকেরও চাহিদা মিটুক। মানুষ আজকের দিনে সরল সোজা-পথে চলতে পারেনা, তারা সর্পের গতিতে এঁকে-বেঁকে চলতে অভ্যস্ত হয়েছে এমনিভাবেই তারা চলছে।

দু'বছর পরে সেই পথে চলতে-চলতে দু'বছর আগের কথাই সোমেশ ভাবে—

চিরবাঞ্ছিতা

কতো বড়ো পরিবর্ত্তনই না ঘটে গেল সমস্ত দেশের ওপর দিয়ে! যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী—তার সঙ্গে-সঙ্গে চুরি, খুন ডাকাতি এসব তো চিরন্তন ব্যাপার। কতো লোক মরেছে, কতক আজও গ্রামে টি'কে আছে, কতক কোথায় চ'লে গেছে। এখানে মিল-কলকারখানা তবু অনেক বেকারকে আজও পোষণ করছে, মাধব দাস অনেককে কাজ দিয়েছেন—এটুকু মহত্ব তাঁর জীবনে দেখা গেছে।

জগৎ চলছে ঠিকই। মাঠ ভ'রে গেছে ধানে, সোনার বরন ধান—ভারে নুইয়ে পড়েছে, বাতাসে দোলা খাচ্ছে, মাঠের ওপর যেন ঢেউয়ের নাচন সুরু হয়েছে।

মাঠ পার হয়ে সোমেশ উঠলো পথের ওপর।

জনহীন পথ, যতদূর দেখা যায় ধূ-ধূ করছে ওধারে দু'বছর আগে কতকগুলি ঘর দেখা গিয়েছিল, কতকগুলি বিদেশী সাঁওতাল সারি-সারি ঘর বেঁধে এখানে কয়েকবছর ধ'রে বাস করছিল। তাদের নিজেদের জমিজমা ছিলনা, পরের জমিতে তারা চাষ-বাস করতো, গ্রামে জন খাটতো, মেয়েরাও তাদের সঙ্গে জন খাটতো, তাছাড়া তারা বাড়ী-বাড়ী ধান ভানতো, চিঁড়ে কুটতো।

আজ তারা কেউ নেই। ঘরগুলোর মধ্যে দু'চারখানা কাত হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে, বাকি-সব ধরাশায়ী হয়েছে। নিজেদের দেশে—মালিকের অত্যাচারে, অভাবের তাড়নায় একদিন যারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসে পরের দেশে খাজনা-করা

জমিতে ঘর বেঁধে ছিল, তারা পঞ্চাশের মন্বন্তরে কে কোথায় যে ভেসে চ'লে গেছে! হয়তো কতজন না-খেতে পেয়ে মরেছে।

দূরে কাকে দেখা যায়। শ্লথ-পদে সামনে অনেকখানি নুইয়ে প'ড়ে ওই কে আসছে।

কাছে এলে চেনা গেল, সে নিতাই মণ্ডল। সাধারণত এরা 'দখনে' নামে এদেশে পরিচিত। আজ কয়েকবছর আগে এইসব কাপালীরা খুলনা-জেলার মধুমতী-নদীর ওপার থেকে এদেশে উঠে এসে বাসা করেছে।

সামনে এসে সে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রে সোমেশের দিকে তাকালে— নেহাৎ অর্থহীন সে দৃষ্টি।

সোমেশ জিজ্ঞাসা করলে, "এ-রকম চেহারা দেখছি যে নিতাই, খবর কি?"

নিতাই তাকে চিনেছে।

অসংলগ্নভাবে সে হেসে ওঠে—"খুব ভালো···সব ভালো ছোটবাবু। গিন্নি ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী নিয়ে বাপের বাড়ী চ'লে গেছে ঝগড়া ক'রে, তাই ওদের আনতে যাচ্ছি।"

"ও" ব'লে সোমেশ এগিয়ে চলে—

নিতাই সঙ্গে-সঙ্গে ফেরে, বলে, "শোনো ছোটবাবু? এই দেখ, ওরা সব এক হয়ে চ'লে গেল। কদিন বাড়ী ছিলুম না, ফিরে এসে দেখলুম, কে—উ নেই। বিষ্টুর মা বললে, ওরা নাকি না-খেতে পেয়ে মরেছে, আর আমার স্ত্রী নাকি গলায় দড়ি দিয়েছে। আর সেই মেয়েটা—বিধবা-মেয়েটা একদিন

কার নাম কোথায় যে চ'লে গেছে, তাকে আর কে—উ খুঁজে পায়নি। পাড়ার লোক আবার আমায় বলে কি জানো ছোটবাবু? বলে, শ্রাদ্ধ করো। সব মিছেকথা ছোটবাবু, সব ওদের বানানো-কথা। আমি কিন্তু ঠিক জানি, তারা কেউ মরেনি, ঘর ছেড়েও যায়নি, গিন্নি ওদের নিয়ে বাপের বাড়ী চ'লে গেছে। আমিও খবর দিয়ে পাঠিয়েছি—এবার ঠিক আসবে, আর সেখানে থাকতে হবেনা। যাই একবার, ইষ্টিশানে গাড়ী আসার সময় হ'লো। এখুনি আসবে, পু—ঝিক্‌ঝিক্‌ ক'রে···”

যে-পথ দিয়ে সোমেশ এলো, সেই পথে সে এগিয়ে চললো।

পাগল হয়ে গেছে নিতাই মণ্ডল, একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে।

এমনি ক'রে কতো প্রিয়জনকে হারিয়ে কতো লোক যে উন্মাদ হয়ে গেছে কে তার হিসেব রাখে! এই নিতাই মণ্ডলের বাড়ীতে তিনটি বড়ো ধানের গোলা, গোয়ালভরা গরু, বাগানভরা তরকারি, বাড়ীতে স্ত্রী, দুই ছেলে, পুত্রবধূ, মেয়ে, নাতি-নাতনী, যাকে বলে—জাজ্বল্যমান সংসার। আজ কিন্তু তার কেউ নেই। বেঁচে আছে একা—নিতাই।

সোমেশের মনে হ'লো, ফিরে যাওয়া যাক্। এ-রকম আরও কতো লোককে দেখা যাবে, তাদের সে সহ্য করতে পারবে না।

অমন কঠিন মন হঠাৎ কি-ক'রে যে এমন কোমল হয়ে পড়লো, সোমেশ নিজেই তা বোঝেনা। একদিন সে নিজে কি না করেছে! আজ কিন্তু সে-সব কথা মনে পড়লেও সে চাপা দিয়ে রাখতে চায়।

ফেরবার কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো, সে আসছে বরুণার পত্র পেয়ে, পরেশদার সঙ্গে শেষ-দেখা করতে। সামনে প'ড়ে রয়েছে তার কর্ত্তব্য। কোমল-মনোবৃত্তির উৎকর্ষতা এখন তার জন্যে নয়।

দ্রুতপদে সে অগ্রসর হলো।

বাইশ

দিন চ'লে যায়।

মৃত্যুপথযাত্রীর দিন ক্রমে ঘনিয়ে আসে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে পরেশ ক্ষীণকণ্ঠে বলে :

'হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে পথপ্রান্তে যদি ফেলে যেতে হয়—
নাই নাই, নাইরে সময়।'

সে হাসে, অতি ক্ষীণ হাসি।

"যাক্, তারপর? তোমার খবর কি ভাই সোমেশ? কাল যখন তুমি এলে, শুনতে পেলুম, বুঝতেও পারলুম, কিন্তু কি-রকম যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলুম, একটি কথাও বলতে পারলুম না, একটিবার তাকাতে পর্য্যন্ত পারলুম না। আমার যা কথা বলবার তা ব'লে নিই, এরপর কখন যে কণ্ঠ চিরতরে

স্তব্ধ হয়ে যাবে তার তো ঠিক নেই। ঘড়ি চলছে বটে টিক্—টিক্—টিক্, কিন্তু কখন কাঁটাটা টুক্ ক'রে থেমে যাবে, স্প্রিং কেটে যাবে। তুমি এ-পর্য্যন্ত যা টাকা পাঠিয়েছো দুঃস্থদের সাহায্যের জন্যে, বরুণার কাছে তার সব হিসেব রইলো, ওগুলো তুমি দেখে নিয়ো।"

রুদ্ধকণ্ঠে সোমেশ বললে, "চিরকালই তো কড়ায়-গণ্ডায় মিলিয়ে হিসেব ক'রে আসছো পরেশদা, কি হবে আর মিথ্যে হিসেব ক'রে?"

"মিথ্যে? মিথ্যে হিসেব?"

পরেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শান্তকণ্ঠে বললে, "হিসেবই ক'রে যাচ্ছি, নিকেশ তো হলোনা সোমেশ! জীবনে কতো এলো—কতো চ'লে গেল, আজ শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাই হিসেব করছি। ভাবছি শুধু, কি পেতে চেয়েছিলুম—কি পেলুম না। কি হতে চেয়েছিলুম—হতে পারলুম না। জীবনভোর শুধু কি মরীচিকাই দেখলুম সোমেশ—সত্যি কি কিছুই নয়?"

সোমেশ তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে মুঠো ক'রে ধীরে গভীরস্বরে বললে, "না দাদা, মরীচিকা নয়, তুমি যা দেখেছো ওই আসল সত্যি। আজ দিকে-দিকে মানুষ জেগেছে, অন্ধকারে আজ কেউ নেই। সবাই আজ বেরিয়ে এসেছে অমৃতের সন্ধানে—কেউ ঘরে নেই। তুমি প্রতারিত হওনি পরেশদা, আমরাও হইনি। তোমাদের মতন সর্ব্বত্যাগের হাতের আলো আমাদের সামনের অন্ধকারকে উদ্ভাসিত ক'রে

তুলেছে—আমরা তোমাদের পথ অনুসরণ ক'রে চলেছি। জানি, লক্ষ্যে পৌঁছোবোই। তোমার মতন একনিষ্ঠ দেশসেবকের এই আত্মদান কি ব্যর্থ হতে পারে? কল্পনায় আমরা যে-সূর্য্যকে পূব-আকাশে উদয় হতে দেখেছি, আজ সেই সূর্য্য উঠছে পরেশদা। কিন্তু বড়ো দুঃখ রইলো, তোমাদের একাগ্র-সাধনায় যা এলো হাতের মুঠোয়, তা তুমি হয়তো দেখতে পাবেনা। অক্লান্তকর্ম্মী, চিরজীবন কেবল দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করেই গেলে, কাজের ফলভোগের সময় তুমি বিদায় নিচ্ছো, এ-ব্যথা রাখবার স্থান নেই যে পরেশদা।"

তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, চোখেও বুঝি জল আসে, তাই তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখের জল সামলায়।

নিঝুমের মতন পরেশ বিছানায় প'ড়ে থাকে—সোমেশ তার পাল্‌স্ দেখে, কিছু পাওয়া যায়না।

বরুণার পানে সে তাকায়—অত্যন্ত অসহায় দৃষ্টি তার চোখে।

রোগীর জন্মে মকরধ্বজ তৈরী করতে-করতে বরুণা মুখ তুলে তাকায়, তার মুখে জাগে করুণ হাসি—সোমেশের মনে হয়, এর চেয়ে তার কেঁদে-ওঠাটাই ভালো ছিল।

"অমন মুসড়ে পড়ছো কেন সোমেশ, আর আমার দিকেই বা অমন ক'রে চাইছো কেন? দেখতে পাচ্ছো—আমি 'শিয়রে সংক্রান্তি' দেখেও হাসছি, অত্যন্ত সহজভাবে কথা কইছি, কাজ করছি! দেখছো আমি কতো শান্ত, নিজের কর্ত্তব্য পালন ক'রে যেতে আমার হাত পর্য্যন্ত কাঁপছে না! তুমি তো জানো

সোমেশ, বিয়ে হয়ে পর্যন্ত নিজের ভাগ্যের সঙ্গে বরাবর যুদ্ধই করছি। যে-মুক্তিকে আজ হাতের মধ্যে পাচ্ছি, হয়তো এই মুক্তিই ছিল আমার চিরকাম্য, আমি নিজের অজ্ঞাতে হয়তো—হয়তো…”

বলতে-বলতে হঠাৎ সে উঠে পড়ে, তারপরই খুব তাড়াতাড়ি বাইরে চ'লে যায়, যেন ভয়ানক একটা জরুরী কাজ ভুলে গেছে, এইমুহূর্তে সেটা না করলে চলছে না।

পরেশের হারানো-চেতনা ফিরে আসে, অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে সে ডাকে—“সোমেশ!”

সোমেশ উত্তর দিলে, “এই যে তোমার পাশেই ব'সে আছি পরেশদা!”

পরেশ জোর ক'রে চোখ মেললে, বললে, “জানো, বরুণার মনে সব হারিয়েও আশা ছিল, সে বলেছিল, আমি একটু সুস্থ হ'লে আমায় দেওঘরে নিয়ে যাবে, আর মহেশমুণ্ডার সেই যে কি-এক জল আছে, তাই এনে আমায় খাওয়াবে। আরও তার কি উদ্দেশ্য ছিল জানো? সে নাকি বৈদ্যনাথের কাছে হত্যা দেবে আমার জন্যে। বুঝেছো? সে কোনোদিন ঠাকুর-দেবতা মানেনি, তুড়ি দিয়ে সব-কিছু চিরদিন উড়িয়ে দিয়ে এসে, আজ আমার বিদায়কালে কিনা এ-সব মানতে চায়। কিন্তু সে মানতে চাইলেও, প্রকৃতি মানবে কেন তা বলো! ভগবান ওর মতন দর্পিতা মেয়েকে অতখানি নীচু হতে দিলেন না—দিতে পারেন না। আমি জোর ক'রে বলেছি—

সে নাস্তিকই থাক, দেশকে ভগবান জেনে একনিষ্ঠভাবে সেবা ক'রে যাক, সেইকাজই হবে তার উপযুক্ত, সেই থাকবে আমার কৃতিত্ব—আমার স্মৃতি। তুমি ওকে নীচু হতে দিয়ো না সোমেশ, তার আগে—সে অধীনতা স্বীকার করবার আগে তুমি ওকে হত্যা কোরো এই আমার শেষ-অনুরোধ।"

সে আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

সোমেশ তার পানে অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। জীবনে সে সকল ধর্ম্মের সার জেনেছিল দেশসেবা, তাই এই ব্রত সে গ্রহণ করেছিল। এই দেশসেবার ব্রত নিয়ে সে সইলে কতো নির্য্যাতন, কতো অত্যাচার—আজ তার কিছু নেই, সম্পূর্ণভাবে পরের দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে সে বেঁচে আছে। তার দেহে আছে শুধু ক'খানা হাড়, তার ওপর চামড়ার একটা আচ্ছাদন, মাংসের চিহ্নমাত্র নেই। নির্য্যাতনে দু'টি দাঁত ভেঙেছিল, আজ একটি দাঁতেরও চিহ্ন তার মুখে নেই,—মাথার চুলগুলো এই ত্রিশ-বত্রিশবছর বয়েসের মধ্যে সব সাদা হয়ে গেছে।

নাঃ, এ-রকম হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ হাজারগুণে, লক্ষগুণে ভালো।

একদিন পরেশের পিতা-পিতামহ ছিলেন এ-অঞ্চলের মধ্যে ধনী-মানী লোক, সেই পিতৃবংশের গৌরব রাখলে পরেশ। সে দিয়েছে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে, নিজে সেজেছে নিঃস্ব ভিখিরী। বাস করবার জন্যে যে ঘরখানা সে তৈরী করেছিল, সে-ঘর আজ থেকেও নেই—পরের বাড়ীতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করছে সে।

আজ সে পেলেনা পথ্য, পেলেনা চিকিৎসক, পেলেনা একফোঁটা ওষুধ।

এইসব লোকেরা কি চিরকালই এমনি ক'রে সয়ে যাবে—শুধু সয়েই যাবে? ক'জন লোক জানবে একটি মহাপ্রাণ এমনিভাবে চ'লে যাচ্ছে? সংবাদপত্রে প্রচার ক'রে—সংবাদপত্রের মারফতে লোককে জানাবে সে—দেশকর্ম্মী পরেশ দাস মারা গেছে?

না। সে-কল্পনা সোমেশ করেনা। পরেশ দাস চায়নি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তার নাম প্রচার হোক। সে চেয়েছিল—অনেক ফুল যেমন লোকচক্ষুর অগোচরে ফুটে গন্ধ বিলিয়ে ঝরে যায়, সেও তেমনি ঝরে পড়বে, মরুতে তার গন্ধ ছড়িয়ে। জনগণের মধ্যে নিজেকে তুলে ধরতে তার কোনো-দিনই প্রবৃত্তি হয়নি।

সোমেশ পলকহীন-চোখে তাকিয়ে থাকে।

ওই যে সজোর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে বুকের পাঁজরা ক'খানা উঠছে-পড়ছে, আজ দেখে কি মনে হয়—ওই বুকের আড়ালে ছিল জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষা? ওগো দেবতা, নিঃশেষে নিজেকে দান করেই গেলে শুধু, এতটুকুও যদি নিজের জন্যে সঞ্চয় রাখতে···

অস্ফুট একটা শব্দ মুখ ফুটে বেরুতেই সেটা নিজের কানে বাজলো—একি! সোমেশ—শক্তিশালী-সোমেশ সামান্য মেয়েদের মতন কেঁদে ফেলেছে? না—না, কান্না তাকে চাপতে হবে, কান্না মোটেই চলবে না।

সোমেশ ধড়ফড় ক'রে উঠে পড়ে—

"দিদিমণি, পরেশদাকে ওষুধটা দাও, দেরী করোনা। আমি একটু ঘুরে আসছি, তুমি একটু থেকো এখানে।"

বরুণা বাইরেই ছিল, সোমেশের ডাকে ঘরে এলো।

সোমেশ তখন উঠে দাঁড়িয়েছে।

মুখে একটুকরো হাসি টেনে এনে বললে, "মুনির কথা ভুলোনা দিদি। কথাতেই আছে না—'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ'—তারপর—তারপর ভবিষ্যৎ তো তোমার-আমার হাতে দিদি, তারজন্যে আমাদের আর বেশীরকম তৈরী হতে হবেনা।"

সে আর বরুণার পানে না তাকিয়েই বার হয়ে পড়লো।

দরজার কাছেই দেখা হলো, মাধব দাসের সঙ্গে। অত্যন্ত ত্রস্তভাবে তিনি এই বাড়ীতেই প্রবেশ করছেন।

"বউমা আছো? বাড়ীতে এসেই শুনলুম, পরেশের বাড়াবাড়ি অসুখ। শুনেই ছুটে এসেছি। এ-খবরটা একখানা পত্রে একটু যদি জানাতে বাছা,—তা তোমরা তো কিছু জানাও না, একেবারে পর বলেই ভাবো। থাকতো আজ তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি, দেখতে, আমায় না জানিয়ে তাঁরা কোনো কাজই করতেন না। তোমরা সব এ যুগের কিনা, কোনোদিনই নিজের ব'লে ভাবতে পারলে না, মা। একটা খবর পর্য্যন্ত দিতে পারলে না।"

বরুণা মাথায় কাপড়টা টেনে, বারান্দার ওপরে নিস্তব্ধে দাঁড়িয়ে রইলো, মুখখানা তার শক্ত হয়ে উঠেছিল।

মাধব দাস এগিয়ে আসছেন দেখে চাপাকণ্ঠে সে বললে, "উনি এইমাত্র একটু ঘুমুলেন, সারা দিনরাত ঘুমোতে পারেন নি কাল, ঘুমটা ভাঙানো ঠিক হবেনা।"

মাধব দাস থমকে দাঁড়ালেন, বললেন, "তবে থাক্, অন্য সময় নাহয় আসা-যাবেখ'ন। ওকে ব'লো, আমি দেখতে এসেছিলুম—বুঝেছো তো?"

বরুণা শক্তমুখেই মাথা কাত করলে—সে জানাবে।

ফিরে যেতে গিয়ে মাধব দাস আবার ফিরলেন—"হ্যাঁ, কি চিকিৎসা করাচ্ছো? দেখছে কে?"

বরুণার মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে, বিকৃতকণ্ঠেই সে বলে, "দেখেছেন ডাক্তার, তাঁরই ব্যবস্থামত চিকিৎসা চলছে।"

মাধব দাস হালকা একটা নিশ্বাস ফেললেন, বললেন, "যাক্, তবু ভালো যে, বড়ো-ডাক্তার চিকিৎসা করছে। ভগবান ওকে ভালো করবেন বইকি বউমা, তুমি একটুও ভেবোনা। তোমার সিঁথের সিঁদূর অক্ষয় হয়ে থাকবে। আচ্ছা, যদি কোনো বিশেষ দরকার পড়ে, আমায় একটা খবর দিয়ো বউমা, আমি এখন কিছুকাল এখানেই থাকবো। আমি না থাকলেও বাড়ীতে আছে আমার মেয়ে, স্ত্রী, তাদের কাছে খবর পাঠালেই আমি যেখানেই থাকবো খবর পাবো। হ্যাঁ, তুমি কিছু ভেবোনা বউমা, আমি বলছি পরেশ ভালো হবেই, তোমার এয়োতির জোরে সে বেঁচে উঠবেই।"

বরুণার আয়তির জোরে—

বরুণার পাতলা ঠোঁট-দুখানা থর্‌থর্ ক'রে কাঁপে—না, না, আয়তির জোর তার যাক্, আর দরকার নেই। আয়তির জোরে সে ওই-মানুষটিকে আর বাঁচিয়ে রাখতে চায়না, তার আয়তির জোর শেষ হয়ে যাক্, আজ অকুণ্ঠচিত্তে সে সেই প্রার্থনা করছে।

একসময় চোখ নামিয়ে সে দেখলে, মাধব দাস তাঁর মোটরে গিয়ে উঠেছেন।

কর্ত্তব্যে তাঁর কেউ কোনোদিন ফাঁকি ধরতে পারেনি—পারবেও না। শোষক-হিসেবে নয়—আত্মীয়তাসূত্রে তিনি পরেশকে দেখতে এসেছেন। লোকে তাঁর এতটুকু ত্রুটি কোনোদিক দিয়ে পাবেনা।

ঘরের মধ্যে পরেশ গ্যাঙাচ্ছে।

বাদলা চ'লে গেছে মায়ের কাছে, আছে বৃদ্ধ হারাধন। সেও ভীষণ-রকম মুস্‌ড়ে পড়েছে।

পরেশের জন্যে সেও আজ দুঃখ করেনা,—এ-মানুষ যাক্, জগতে এর থাকা আর নয়। তার দুঃখ হ'চ্ছে, বরুণার জন্যে। পাষাণ-প্রতিমা বরুণা, তার মুখের দিকে চাওয়া যায়না। তার দিকে তাকিয়ে হারাধন কেঁদে ফেলে, বলে, "হাসিস নি মা, তুই আর কান্না চাপা দেবার জন্যে হাসির ঢাক্‌নি দিসনি। তার চেয়ে তুই কাঁদ—চেঁচিয়ে কাঁদ।"

তবু বরুণা হেসে ঘরের মধ্যে চ'লে যায়, পাখাখানা হাতে নিয়ে স্বামীর পাশে বসে।

তেইশ

ভেঙে-চুরে গেছে গ্রাম।

সোমেশ দেখতে-দেখতে পথ চলে।

মনটা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, উৎসাহ তার আর এতটুকু নেই। যে-উৎসাহ নিয়ে সে এসেছিল তা নিঃশেষে মুছে গেছে।

সোমেশ পথ চলে। অন্যমনস্কভাবে সে হাটে,—গন্তব্যের তার ঠিক নেই।

গ্রামের ওধারে কারখানা-অঞ্চল,—কলোনী—এখানে বাস করছে তারা—যারা কল-কারখানায় কাজ করছে।

পরিষ্কার ঝরঝরে একখানি নতুন গ্রাম, মোটর চলার উপযুক্ত পিচ-ঢালা বাঁধানো-পথ, সবুজ-ঘাসে-মোড়া পথের দুধারে গাছ বসানো হয়েছে—সেসব গাছে ফল না ধরুক, ধরবে ফুল—জাগাবে রঙের সমারোহ।

সোমেশ অন্যমনস্কভাবে পিচ-ঢালা পথে হেঁটে চলে।

কোথায় চলেছে সে, কেন চলেছে এদিকে তা সে নিজেই জানেনা, তবু সে চলেছে।

হঠাৎ একসময় তার চমক লাগে, সে এসে দাঁড়িয়েছে পরেশের পৈত্রিক-ভিটেয়—যা বর্তমানে হাসপাতালে পরিণত হয়েছে ঠিক তারই সামনে।

মস্ত বড়ো কোলাপ্‌সিব্‌ল্ গেট, তার দুদিকে চ'লে গেছে

লোহার রেলিং, ভেতরে লাল-সুরকী-ঢালা পথের ধারে-ধারে সিজ্‌ন্‌-ফ্লাওয়ারের অসংখ্য গাছ—তাতে অসংখ্য ফুলও ফুটেছে।

সোমেশ তাকিয়ে থাকে।

এতবড়ো বাড়ী যার, সে আজ তার শেষনিশ্বাস ত্যাগ করছে কোথায়—পরের ভিটেয়, পরের ঘরে! কেন, এতবড়ো বাড়ীটার কোনো-একটা ঘরে একখানা বেড্‌ সে পেতে পারলে না? তাকে দেখতে আজ গেলনা ডাক্তার, সে পেলেনা ওষুধ, পথ্য?

চিরদিনের নাস্তিক সোমেশ আজ এইমুহূর্ত্তে একবার আকাশের পানে চায়—

"তুমি আছো কি? সত্যিই তুমি আছো কি? যদি থাকো, হে অদৃশ্য মহাশক্তি, যদি পাপপুণ্যের মাপ-যন্ত্র তোমার থাকে, ধর্ম্মাধর্ম্ম যদি বিচার করো, তাহলে আজ তুমিই দেখো —মাপ তুমিই কোরো, বিচারও তুমিই কোরো।"

"এ কি, আপনি এখানে সোমেশবাবু! কখন এলেন?"

আত্মবিস্মৃত সোমেশের চেতনা ফিরে এলো, তাকিয়ে দেখলে, হস্‌পটালের বড়ো-ডাক্তার প্রসন্ন বোস, তার পাশে চলেছে—বনানী। সম্ভব, সে হাঁসপাতাল দেখতে এসেছে।

বনানী এগিয়ে আসে, ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, "গেটের বাইরে কেন সোমেশবাবু, ভেতরে গেলেন না কেন?"

সোমেশ বললে, "ভেতরে যাবার জন্যে আসিনি মিস দাস, বেড়াতে-বেড়াতে এসেছি, হঠাৎ বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে

অনেক কথা মনে প'ড়ে গেল, আর নড়তে পারলুম না তাই দাঁড়িয়েছিলুম।"

ডাক্তার স্মিতহাস্যে কাছে আসেন, নমস্কার ক'রে বলেন, "আপনাদেরই দেশের প্রতিষ্ঠান সোমেশবাবু, আপনারা দেখা-শোনা করলে আমরা কেবল আনন্দই পাবোনা, যথেষ্ট উৎসাহও পাবো, সেইজন্যে আমরা আপনাদের চাই। বুঝছেন তো?"

সোমেশ গম্ভীরমুখেই উত্তর দিলে, "যথেষ্ট বুঝেছি ডক্টর বোস, বুঝতে এতটুকু বাকি নেই। কতো বড়ো ধ্বংসের স্তূপের ওপর গ'ড়ে ওঠে কতো বড়ো প্রতিষ্ঠান—কিন্তু যদি সত্যিকার স্পৃহা থাকে মনের মধ্যে—শোনা যাবে ওর প্রতি ইঁটের ফাঁকে-ফাঁকে অতীতের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ, শোনা যাবে কতো করুণ কাহিনী। কতো কান্না, কতো হাসি জড়িয়ে আছে ওই বাড়ীর জীর্ণ পাঁজরে—সে যে কতো যুগ-যুগান্তর, তা খুঁজতে পুরনো ইতিহাস পড়তে হয়। আমি তাই শুনছিলুম ডক্টর বোস, শুনছিলুম ওর গুম্‌রে-গুম্‌রে কান্নার শব্দ, শুনছিলুম ওর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ, চোখের সামনে ফুটে উঠছিল অতীতের বেদনাময় ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা—লেখাগুলো পড়ছিলুম।"

অত্যন্ত বিমনা হয়ে পড়েছিল বনানী দাস। মুখখানা তার কি-রকম অসহায়ের মতন দেখাচ্ছিলো। কিন্তু ডাক্তারের মস্তিষ্কে সোমেশের কথার ভাবার্থ প্রবেশ করতে পারেনি, রসিকতা ভেবে তিনি উচ্চহাস্য করলেন—"ঠিক কথা বলেছেন সোমেশবাবু, ঠিক কথা। তবে শুধু অতীতকে নিয়েই

আলোচনা করবেন না, বর্ত্তমানের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন—এইসব গেঁয়ো-রোগী নিয়ে দিন কাটাতে হয় আমাদের। এক-একটা এমন উজবুকও আসে, যারা ইন্‌জেক্‌শান" কাকে বলে জানেনা, সিরিঞ্জ নিয়ে কাছে যাবার আগে কেবল আসতে দেখেই 'সেন্স' হারায়। তারপর কি কান্না, কি চেঁচানো—উঃ, ঝালাপালা হয়ে গেলুম একেবারে, আর ভালো লাগেনা। মনে হয়, সব ফেলে রেখে, টেনে ছুট দিই।"

বনানীর মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নরম ক'রে সে বলে, "এটা সব-হাঁসপাতালেরই দস্তুর মিঃ বোস, হাঁসপাতালে কেবল শিক্ষিত-ভদ্রলোকেই আসেনা, বিশেষ ক'রে, গরীবদের জন্যেই হাঁসপাতাল। কারণ, তারা পয়সা খরচ ক'রে ডাক্তার ডাকতে পারেনা, ওষুধ কিনতে পারেনা। হাঁসপাতালের রোগীদের এসব অত্যাচার আপনাদের সইতেই হবে, সইবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আপনাদের আসা দরকার।"

তার কণ্ঠস্বরে একটা কি-রকম বেসুরো-আওয়াজ পেয়ে ডাক্তার সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন, তিনি বনানীর পানে সতর্কদৃষ্টিতে তাকান। মাথাটা কাত ক'রে, হাসি দিয়ে মনের ভাবটাকে চাপা দিয়ে তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই! মাইনে-হিসেবে আমরা কাজ করিনে মিস দাস, ডিউটি-হিসেবে কাজ ক'রে যাচ্ছি এ-কথাটা ঠিকই জানবেন। আজ বলুক [illegible]দখি ওইসব রোগীরা যে, এ-হাঁসপাতালে তারা যা চিকিৎ[illegible]য়—যা যত্ন পায় তা আর কোনো হাঁসপাতালে পেয়ে[illegible]না—দেখেছে

কিনা! ওই যে আমাদের কলের ছোট্টু সিং, বনওয়ারীলাল, রাম মহান্তি, এরা হাজারমুখে বলে—ডাক্তারবাবু, কলকাতার বড়ো হাঁসপাতাল-ফেরত আমরা, এমন যত্ন-স্নেহ আর কোথাও পাইনি।"

সগর্ব্বে গোঁফে তা দিয়ে আড়চোখে তিনি বনানীর পানে তাকান। আরও কি বলবার ইচ্ছে ছিল, সোমেশ মাঝপথে বাধা দিলে—"আপনার ভিজিট কতো ক'রে মিঃ বোস?"

"ভিজিট?" ডাক্তার যেন আশ্চর্য্য হয়ে তার দিকে তাকান।

সোমেশ বলে, "হ্যা। বাইরে কেউ 'কল' দিলে আপনি কি-রকম ফিজ্ নেন?"

বনানী কি বলিতে যাচ্ছিলো, সোমেশ তাকে বাধা দিলে—"আপনি থামুন মিস দাস, মিঃ বোস অনেক সময় বাইরের কলেও গিয়ে থাকেন, ভিজিটও নেন, আমি শুধু তার পরিমাণটা জিজ্ঞাসা করছি।"

ডাক্তার বললেন, "জোর অবশ্য আমি করিনি, বাঁধা রেটও আমার নেই, যার যা খুশি দিক-চাই না-দিক তাতে আমার কিছু আসে যায়না। খুশী-মনে যে যা দেয়।"

বাধা দিয়ে সোমেশ বললে, "দু'আনা চারআনাও আছে তার মধ্যে! আচ্ছা মিঃ বোস, বরুণা-দিদিমণি আপনাকে 'কল' দিয়েছিলেন, আপনি যাননি—সে কি তিনি গরীব ব'লে? ভিজিট দিতে পারবেন না ব'লে? আপনি এ কথা বলতে পারেন

না যে, মিলের মজুর ছাড়া, বা, এই হাঁসপাতাল ছাড়া আর কোথাও বাইরের রোগী দেখেন না। তবে কিসের জন্যে আপনি পরেশদাকে একটিবার দেখতে গেলেন না আমি শুধু এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করছি আপনাকে।"

ডাক্তারের মুখখানাই শুধু নয়, সমস্ত দেহখানা পর্য্যন্ত কঠিন হয়ে উঠলো, তিনি কোনো উত্তর দিলেন না।

সোমেশ দৃপ্তকণ্ঠে বললে, "আপনি অতীতের সে ইতিহাস জানেন না ডক্টর বোস, জিজ্ঞাসা করুন সকলকে, যে-কেউ সে-কাহিনী আপনাকে শোনাবে—এই বাড়ীর প্রত্যেক ইটখানাকে জিজ্ঞাসা করুন, ওরা ওর পূর্ব্বপুরুষের কাহিনী আপনাকে শোনাবে। আজ এই বাড়ীর মালিক, এই বংশের বংশধর কোথায় শেষনিশ্বাস ফেলছে জানেন? নিজের পিতৃপুরুষের ভিটেয় মরবার তার অধিকার নেই, সে বেড়ালে পথে-পথে, সে বাঁধলে ঘর, কিন্তু সে ঘরও তার ভাঙলো পুলিসের অত্যাচারে।"

বিবর্ণমুখে বনানী ব'লে ওঠে, "পুলিসের অত্যাচারে?"

সোমেশ বিক্ষুব্ধকণ্ঠে উত্তর দিলে, "হ্যাঁ। আপনার দাদা পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিলেন মিস্ দাস! যাক্ ওকথা। যার সব গেল সে যখন এ-ক্ষতিও হাসিমুখে সয়ে গেল, আমার সেখানে কথা বলবার কিছু নেই। হ্যাঁ, আমি তাই দেখছিলুম ডক্টর বোস, আপনার হস্‌পিটাল দেখতে আমি আসিনি। আমি দেখতে এসেছিলুম সেইসব আত্মাদের—যারা আজও এই

ইঁট-কাঠের মায়ায় জড়িয়ে আছে এখানে, তাদের জানাতে এসেছিলুন—তাদের শেষ-বংশধরের আজ যাবার সময় হয়েছে।"

বলতে-বলতে সোমেশের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

তখুনি সে নিজেকে সামলে নেয়—বনানীর পানে তাকিয়ে হেসে বলে, "কিছু মনে করবেন না মিস দাস, জেলে ছ'সাতটা বছর ঘানি ঘুরিয়েছি কিনা, তাই মনটা সেই বর্ব্বর আদিম-যুগেই ফিরে গেছে। শুধু চোখ বুজে স্বপ্ন দেখি···আমি ঘানি ঘোরাচ্ছি···তা-থেকে বেরোচ্ছে সোনার মতন রং খাঁটি সরষের তেল···আজকালকার দিনে খাঁটি-তেল যে দুষ্প্রাপ্য, সেটা তো জানেন? তারপর চোখ খুলে দেখি—যথা পূর্ব্বং তথা পরং। প'ড়ে আছি সেই পাঁকের মধ্যে, সারা-গা আমার পাঁকে ভ'রে গেছে। আচ্ছা, আসি ডক্টর বোস, আসি মিস দাস,—অপরাধ নেবেন না আমার এইসব অসম্বদ্ধ কথায়।"

সে অগ্রসর হয়—পেছনে-পেছনে বনানী আসে তার সে খেয়ালই থাকেনা।

তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে বনানী হাঁপিয়ে ওঠে, অসহিষ্ণুকণ্ঠে সে বলে, "তা একটু আস্তেই নাহয় চলুন! অত তাড়াতাড়ি লম্বা পা ফেললে আমি কি আপনাকে ধরতে পারি?"

সোমেশ থেমে ফিরে তাকায়—বিস্ময়ে বলে, "আপনি যাচ্ছেন কোথায়?"

বনানী সংক্ষেপে উত্তর দেয়, "আপনার সঙ্গে।"

"আমার সঙ্গে ?" সোমেশ আশ্চর্য্য হয়, ততক্ষণে বনানী তার পাশে এসে দাঁড়ায়, সে তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছিলো।

সোমেশ বললে, "আমার সঙ্গে কোথায় যাবেন ?"

বনানী উত্তর দিলে, "আমি আপনার সঙ্গে গ্রামে ফিরবো সোমেশবাবু। আমার গাড়ী আছে, এতটা পথ হেঁটে যাওয়ার চেয়ে, গাড়ীতে আসুন না।"

সোমেশ হাসলে—"গাড়ী ? না, গাড়ীতে আমি উঠবো না মিস দাস, আমি হাঁটতেই ভালো জানি—হেঁটেই ফিরে যাবো।"

বনানী বললে, "তবে চলুন, আমিও হেঁটেই যাবো।"

সোমেশ শশব্যস্ত হয়ে ওঠে, "না, না, আপনি অতটা পথ হাঁটতে পারবেন না।"

বনানী গম্ভীরমুখে বললে, "দেখাই যাকনা হাঁটতে পারি কিনা। বাবার শাসন-গণ্ডি ছাড়িয়ে এসেছি, এবার নাহয় আপনার শাসন-গণ্ডির মধ্যেই একবার ইচ্ছে ক'রে প'ড়ে দেখি, কি পরিণাম হয়।"

সোমেশকে পেছনে ফেলে সে এগিয়ে চলে।

চব্বিশ

কারখানা-অঞ্চলের বাইরে সবুজ-ধানে-ভরা মাঠের মাঝখান দিয়ে চওড়া বাঁধানো-পথ। এ-পথ সোজা চ'লে গেছে ষ্টেশনের দিকে।

সন্ধ্যার মৃদু-অন্ধকার আকাশ হ'তে কুয়াশার মতন ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীর ওপর। পাখীরা যে-যার কুলায় ফিরে গেছে, দু-একটা পথহারা-পাখী এখনো বাসা খুঁজছে, তাদের কাকলী এখনো কানে আসছে।

বাতাস বহুদূর হ'তে বয়ে আসে।

চলতে-চলতে সোমেশ বললে, "আপনি কিন্তু জিদ ক'রে আমার সঙ্গে এতটা পথ হাঁটলেন। কাজটা ভালো হচ্ছেনা মিস দাস।"

বনানী মুখ ফেরালে, শান্তকণ্ঠে বললে, "বার-বার 'মিস দাস' ব'লে না ডেকে, ছোটবেলাকার মতন নাম ধ'রে ডাকলেই বিশেষ বাধিতা হবো সোমেশবাবু।"

এ-মেয়ের কথার ভাবে, চালচলনে সোমেশ সতর্ক হয়ে ওঠে। মাধব দাসের মেয়ে, বিভূদাসের বোন—হঠাৎ এতটা অন্তরঙ্গতা মোটেই ভালো ব'লে ঠেকেনা।

না-ঠেকাই স্বাভাবিক। বনানীর পিতা এবং দুই ভাইকে সোমেশ বেশ চেনে। আসার দিন শিয়ালদয় বড়ো-ভাই শুভর সঙ্গে সোমেশের দেখা হয়েছিল। শুভ তাকে চিনেও

চিনতে পারেনি, তার পানে চেয়ে বিকৃত মুখভঙ্গি ক'রে সে তাড়াতাড়ি স'রে পড়েছিল।

সেই শুভর ছোট-ভাই বিভূ দাস—তাকে না-চেনে এমন লোক খুব কমই আছে। কয়েকবছর আগে পুলিসের ইনফরমার হিসেবে কাজ করতে নেমে, সে আজ তার কাজ দেখিয়ে অসম্ভব উন্নতি করেছে। হয়তো এ-বছর তার অদৃষ্টে একটা খেতাবও মিলতে পারে।

সেই ভাইদের বোন, মাধব দাসের হাতে-গড়া বনানী—যে মাধব দাস প্রথম-যৌবনে ছিলেন সামান্য দোকানদার, কিন্তু আজ তিনি শুধু জমিদার নন, এত বড়ো একটা মিলের সর্ব্বময় কর্ত্তা, প্রতিদিন তাঁর আয়ে সিন্দুক ভ'রে ওঠে। সোমেশ সাবধান হয়।

বনানী ব'লে চলে, "আপনার সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছি ব'লে বাবা কিছু বলবেন ভাবছেন, কিন্তু বাবার বোঝবার শক্তি আছে যে, আমি বি-এ পাশ করেছি, খারাপ বা ভালো বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে। আপনার সঙ্গে যাওয়াটা এমন-কিছু অন্যায় কাজ নয় যে তাতে কেউ—"

সোমেশ বাধা দিলে, "সব বুঝেছি, কিন্তু আপনি আর-কারও কাছে না হোক, নিজের কাছেই যে বার-বার জবাবদিহি দিচ্ছেন। এরই জন্যে আমি বেশ বুঝছি, আপনি জোর ক'রে আমার সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু নিজের মনে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করছেন। হয়তো আপনার বাবার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবেনা, কিন্তু নিজের কাছে আপনি না দিয়ে পারছেন না।

সাইকোলজি বলে—মানুষ মনে যত দুর্ব্বল হয়, মুখে তত আস্ফালন করে। আমি তো মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশী পড়েছেন, বলুন তো—আমার কথা ঠিক কি না?"

বনানী জোর ক'রে বলে, "মোটেই না—মোটেই না সোমেশবাবু, আমি অন্যায় কিছু করিনি। আমার বিবেকে যা বাধেনা, আমি তাকেই সত্যি ব'লে জানি। আসল কথা বলুন—আমি বিশ্বাস করতে চাইলেও, আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না।"

সোমেশ জিজ্ঞাসা করলে, "তার মানে?"

বনানী মুখ ফেরালে, একটিমাত্র শব্দ তার মুখ হতে নির্গত হলো, "বিশ্বাসঘাতকতা।"

"বিশ্বাসঘাতকতা?"

সোমেশ টেনে-টেনে হাসে।

বনানী মুখ তুলে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "একদিন ছিল, যেদিন কিছু বুঝতুম না, সেদিন যা-কিছু পেয়েছি নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করেছি, জানতে চাইনি—কোথা হতে কি-ভাবে পেলুম। এইরকম অজস্র পেয়েও তৃপ্তি হয়নি, আমার চাহিদা আরো বেড়েই চলেছিল সোমেশবাবু। কিন্তু, আজ? আজ আমার শিক্ষা, আমার জ্ঞান আমায় বুঝতে দিয়েছে যে, আমি যা পাচ্ছি তা কতোখানি অবৈধভাবে পাওয়া। সোমেশবাবু, আজ সেইসব জিনিস নিতে আমার বিবেক বাধা দেয়, আপনি তা বিশ্বাস

করবেন কি? আমার বাবা যদি আজ সেই আগের দরিদ্রাবস্থায় থাকতেন, আমি তাতে যত খুশী থাকতে পারতুম তা আর আপনাকে ব'লে বোঝাতে পারবো না।"

বনানী নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

সোমেশ তার মুখখানা দেখবার চেষ্টা করে, সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায়না।

সে হেসে ওঠে, "আপনি মিথ্যে কষ্ট বহন করছেন বনানী দেবী! এর নাম, সাধ ক'রে দুঃখ বওয়া—দুঃখ কেনা।"

"সাধ ক'রে?"

বনানী যেন আশ্চর্য্য হয়ে যায়, "আপনি কি বলছেন সোমেশবাবু? সাধ ক'রে কেউ দুঃখ বহন করে?"

সোমেশ বললে, ক'রে বইকি বনানীদেবী—করে। যারা চিরজীবন একটানা সুখে কাটিয়ে এসেছে, তারা ইচ্ছে ক'রে দুঃখের আস্বাদ পেতে চায়। কি দরকার আপনার এই মহাজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনায়,—আপনি যেমন আনন্দে দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন তাই কাটান, কে কি বললে না-বললে, কে কি ভাবলে না-ভাবলে, তা নিয়ে আপনার মন খারাপ করবার তো দরকার নেই! এই যে গতবারের দুর্ভিক্ষে লক্ষলক্ষ লোক না-খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরলো, কতো মেয়ে আত্মহত্যা করলে, কতো মেয়ে ভেসে গেল, তাতে আপনার কিছু হয়েছে? আপনি তাদের দুঃখে কোনোদিন আহার ত্যাগ করেন নি, কোনোদিন আপনার আমোদ-আহ্লাদের ব্যতিক্রমও হয়নি। কাজেই, যা বাইরের

জিনিস তা বাইরেই থাক, এ-দেশে দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসে কলের কুলিমজুর, মাঠের চাষাভুষোর জন্যে মনের মধ্যে এতটুকু দুঃখ আনা, আপনার মত মেয়ের পক্ষে একেবারেই উচিত নয়।"

বনানী থমকে দাঁড়িয়ে যায়, অকস্মাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, "সোমেশবাবু ?"

তারপরই সে সংযত হয়ে যায়, আস্তে-আস্তে চলতে-চলতে বলে, "হ্যাঁ, এসব কথা আপনি বলতে পারেন—বলবার অধিকার আর-সকলের মতন আপনারও আছে। আচ্ছা সোমেশবাবু, নাই-বা করলেন আপনি বি-এ এম-এ পাস,—আমি জানি, ইউনিভার্সিটির এ অসার ডিগ্রির চেয়ে বেশী জ্ঞান আপনার আছে, সেইজন্যেই জিজ্ঞাসা করছি—বলুন, পিতার পাপে কি সন্তানকেও আজীবন শাস্তি বইতে হয় ?"

সোমেশ উত্তর দিলে, "না বনানীদেবী, আমরা জানি, যে-যার নিজের পাপের ফল ভোগ করে, বংশ ধ'রে শাস্তি চলতে পারেনা। তা যদি হতো, চ্যবনঋষির ছেলে রত্নাকর প্রসিদ্ধ দস্যু হতে পারতো না—তা যদি হতো, খুনীর ছেলে সাধু হতোনা। ব্যতিক্রম হয় বইকি। বহুক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম দেখা যায়।"

বনানী একটা নিশ্বাস ফেলে—"তাহলে আমি মুক্ত ?"

সোমেশ বিস্মিতকণ্ঠে বললে, "আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারলুম না বনানীদেবী। কি হতে আপনি মুক্তিলাভ করতে চান সেটা বলুন।"

বনানী হাসে—"আপনি বুঝছেন সবই, তবু কিছু না-বোঝবার ভাণ করছেন তা আমি জানি সোমেশবাবু। আমার বাপ-ভাইয়ের পরিচয় আমি যত জানি, আপনি তত জানেন না একথা তো মানবেন? বাবা শুধু চেয়েছেন বড়ো হতে—আরও বড়ো হতে, যে-কোনোদিক দিয়ে—যেমন ক'রে হোক, অর্থোপার্জ্জনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আমি জানি, এমন কোনো মন্দ কাজ নেই যা তিনি করেন নি। পরেশদার দেশভক্তির সুযোগ নিয়ে তিনি তাঁকেই শুধু সর্ব্বস্বান্ত করেন নি, মিলের সিনিয়র-পার্টনার গণেশলালকেও তিনি দেনার দায়ে আত্মহত্যা করতে সুযোগ দিয়ে, নিজে একমাত্র মালিক হয়ে বসেছেন। না, বাধা দেবেন না সোমেশবাবু, আমায় আজ সব বলতে দিন—না বলতে পারলে আমি পাগল হয়ে যাবো, নয়তো আত্মহত্যা করবো। যেদিন হতে আমি তাঁকে চিনেছি, সেদিন হতে নিদারুণ ঘৃণা এসেছে আমার নিজেরই ওপর, যেহেতু আমি তাঁর আত্মজা, তাঁরই রক্ত বইছে আমার দেহে তারপর—তারপর—"

বলতে-বলতে সে মুহূর্ত্তের জন্যে থামে, আবার বলে—

"আমার দুটি দাদা। একজন বিচারাসনে ব'সে ত আইনের মর্য্যাদা রেখে কাজ করছে, কিন্তু যখন সে বিচারাস হতে নেমে আসে, তখন সে মানুষ থাকেনা সোমেশদ আমার বাবার লোভ মূর্ত্ত হয়ে ওঠে তার মধ্যে দিয়ে। আ ছোড়দা—যার নাম বিভূদাস, তার কথা বলবো না সোমেশদ

সে থাক্। মোট কথা, আমি এদের সান্নিধ্য এড়াতে চাই—কেউ যেন না বলতে পারে যে, আমি ওই-বাপের মেয়ে, এই ভাইদের বোন।"

সোমেশ হাসে, নিঃশব্দে সে হাসে মাত্র।

"সান্নিধ্য এড়াতে পারবেন না বনানীদেবী, বেঁচে থেকে সম্পর্কও ভুলতে পারবেন না। ওসব কথা বাদ দিন, বরং অনুতাপ করুন, মনে-মনে শুধু অনুতাপ করুন, তাতে হয়তো পথ পাবেন আর সেইটেই হবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত। হিন্দুশাস্ত্রে একটা কথা আছে—বংশে যদি একটি সুপুত্র হয়, তার পুণ্যে ঊর্দ্ধতন আর অধস্তন চতুর্দ্দশপুরুষ নাকি স্বর্গে যায়। আপনার অনুতাপে ওঁরাও মুক্তি পাবেন এই বিশ্বাসটাই মনে রাখুন।"

দৃপ্তকণ্ঠে বনানী বললে, "আপনার উপদেশ পাবার অনেক আগে আমার পথ আমি নির্ব্বাচন ক'রে নিয়েছি সোমেশবাবু। একদিন জানতে পারবেন, বনানী দাস কোথায় যেতে কোথায় এসে পড়েছে। আমার বাপ-ভাই সেদিনও বর্ত্তমান থাকবেন, তবে আমায় জোর ক'রে তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদ করতে হবেনা, ওঁরা নিজেরাই আমার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করবেন সেদিন। আপনি দেখে নেবেন।"

অন্ধকার ততক্ষণে জমাট বেঁধেছে। তার মধ্যে দিয়ে সোমেশ, বনানীর মুখখানা দেখতে আবার চেষ্টা করে—কিছু দেখা যায়না।

বহুদূরে মোটরের হর্ণ শোনা যায়।

সোমেশ হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, "আপনার বাবা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন, নিশ্চয়ই ড্রাইভার গিয়ে তাঁকে খবর দিয়েছে, আপনি আমার মতন একজন অ্যানার্কিষ্টের সঙ্গে একা হেঁটে চলেছেন। তিনি যে আপনাকে নিতে আসছেন তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।"

বনানী কেবলমাত্র ব'ললে, "অ্যানার্কিষ্ট ?"

সোমেশ বললে, "অ্যানার্কিষ্ট আজও মরেনি—তাই-না স্থগিত হলো নিরুদ্দেশের পথযাত্রী ? ফিরে সে আসবে কিনা তার কোনো ঠিক নেই। অ্যানার্কিষ্টদের ভীতি—রাজভক্তদের মন হতে আজও মেলায়নি বনানীদেবী, ওঁরা আজও অ্যানার্কিজমের স্বপ্ন দেখে থাকেন। আপনার বাবা সবদিক দিয়ে আপনাকে স্বাধীনতা দিলেও তিনি চাননা, তাঁর মেয়ে আমার মতন ভীষণ একজন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে। তিনি নিজেই গাড়ী নিয়ে আসছেন। আপনাকে তিনি রাজদ্রোহীতার আওতা হতে সব-রকমে বাঁচাতে চান কিনা।"

মোটরের হেড-লাইটের তীব্র আলো সামনের পথে ছড়িয়ে পড়লো, ভোঁ ক'রে মোটরখানা সামনে এসে [illegible] গেল, সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে যে নেমে এলো, তাকে এখানে এভাবে দেখার কল্পনা সোমেশ করতে পারেনি।

"বনানী, গাড়ীতে এসো।"

বিভূদাসের কণ্ঠস্বর অতি রুক্ষ।

বিস্মিতা বনানী বলে, "একি ছোড়দা, তুমি কখন এলে ?"

সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিভূদাস আবার ডাকলে, "গাড়ীতে এসো বনানী, হেঁটে যাওয়া হতে পারেনা।"

বনানী গোলমাল বা আপত্তি কিছুই করলে না, নিঃশব্দে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো, সোমেশের সঙ্গে আর একটি কথাও বললে না।"

মোটর মোড় ঘুরে চ'লে যায়। সোমেশ গাড়ীর পেছনের লাল আলোটার পানে চেয়ে থাকে। সে ভাবে—

ধনীর আদরে পালিতা মেয়ে, দেশের খোঁজ এরা কতটুকু রাখে—দুঃখ-বেদনার কতটুকু এরা জানে। এইসব ধনীর দুলাল-দুলালীরা সহরে দুঃস্থদের জন্যে মিটিং ডাকে, কথা গেঁথে-গেঁথে করতালি নেয়, দুঃখীর দুঃখে তাদের চোখ হয়ে ওঠে অশ্রুময়, কিন্তু বাস্তব তার মধ্যে আছে কতটুকু? করতালি নেবার জন্যে, নাম জাহির করবার জন্যে যেটুকু করা সাজে, তার অতিরিক্ত এরা করেনা। সত্যিকার দরদ এদের মধ্যে ক'জনের আছে—ক'জন সত্যিই দেশের কাজ করতে নেমে পড়েছে?

ধনীর দুলালী ভুলে যাবে এখুনি সে যেসব কথা ব'লে গেল। এতক্ষণ 'হলে' হয়তো পিয়ানোর সামনে বসেছে, এতক্ষণ হয়তো নাকিসুরে বিনিয়ে-বিনিয়ে গান ধরেছে…

সোমেশ আবার অন্যমনস্কভাবে পথ হাঁটে।

পঁচিশ

বরুণা স্থান ক'রে নিয়েছে গ্রামে।

সোমেশ চ'লে গেছে। কোথায় গেছে তা কিছু ব'লে যায়নি। এ-ছেলে যে একভাবে বেশীদিন থাকতে পারেনা তা বরুণা জানে, সে শুধু এদেশে-ওদেশে বেড়াবে।

সোমেশ চ'লে গেছে, বরুণার দেখাশোনা করবার ভার দিয়ে গেছে, হারাধন আর খ্যাঁদার ওপর। খ্যাঁদা ও তার স্ত্রী রাধা, বরুণার কাছে থাকে। খ্যাঁদা, মাধববাবুর কাজ ছেড়ে দিয়ে এসেছে, আবার সে তার ত্যক্ত-কাজ পেয়েছে। বরুণার ঘর দু'খানা তারাই সংস্কার করেছে—উঠোনের একপাশে বরুণার আদেশে খ্যাঁদা নিজের ঘর তুলেছে, এখানেই তারা থাকে। বাদলা দেশ হতে ফিরেছে, বরুণার কাছে সে দিনরাতই থাকে, হারাধন এদের সকলকে দেখা-শোনা করে।

বরুণার জীবনে শ্রান্তি এসেছে।

সোমেশ তাকে ডেকেছিল—"ওঠো দিদিমণি, তোমার কাজ করবে চলো, এ-রকমভাবে প'ড়ে থাকলে তোমার ব্যাধি শীগগির জরা আসবে যে!"

বরুণা হেসেছিল, বলেছিল, "আর সে-উৎসাহ পাচ্ছিনা ভাই, আর আমায় এতটুকু শক্তি নেই। আমায় এখন কিছু-দিন বিশ্রাম করতে দাও সোমেশ, বিশ্রাম নিয়ে হয়তো আমি আবার কাজ করতে পারবো।"

বিস্মিত-চোখে সোমেশ চেয়ে দেখে—বরুণা থান পরেছে, হাতের শাঁখা ভেঙে ফেলেছে। সেদিন হঠাৎ যখন সে বাড়ীতে ফিরে বরুণার মাথার চুলগুলো কাটা-অবস্থায় দেখলে, তখন সত্যিই তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়লো। দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপুড় হয়ে প'ড়ে রইলো, একটি কথা বললে না, উঠলো না, বরুণার অনেক অনুনয়েও কিছু খেলেনা। আর-একদিনের কথা—

বরুণার সেদিন একাদশী তা সোমেশ জানতো না। প্রথম-দিনের একাদশী, সেদিনকার অসহ্য কষ্টে তার মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছিল। সোমেশ নিজে খেতে ব'সে, পাশে বরুণার ভাত না দেখে জিজ্ঞাসা করলে "তোমার ভাত কই দিদি?"

বরুণা কথা বলেনা, কি-একটা তরকারি আনবার অছিলায় উঠে যায়। রাধা জানিয়ে দেয়—আজ একাদশী কিনা, তাই দিদিমণির জলস্পর্শও করতে নেই।"

একমুহূর্তে নিজের ভাত-তরকারি সোমেশের মুখে বিস্বাদ হয়ে ওঠে। অর্দ্ধেক খাওয়া তার হয়েছিল মাত্র, আর অর্দ্ধেক ভাত নিয়ে অনর্থক সে নাড়াচাড়াই করতে থাকে, একটা ভাত আর মুখে দিতে পারেনা।

বরুণা তরকারি আনবার আগেই সে উঠে পড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি ক'রে কাজের অছিলায় কখন স'রে পড়ে।

ফিরলো সে রাত্রে। বরুণা ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার সাড়া পেয়ে জেগে, দরজা খুলে বাইরে এলো।

লণ্ঠনের আলোয় বরুণার মুখ দেখা যায়,—যেন বি
রজনীগন্ধা।

রুদ্ধকণ্ঠে সোমেশ বললে, "আমি আজ খাবোনা দিদি! খাবার তোমায় আনতে হবেনা। এবার থেকে একটা কথা জেনে রেখো, আমিও নির্জলা-একাদশী করবো।"

বরুণা হাসে—"তার মানে? তুমি তো বিধবা হওনি সোমেশ!"

সোমেশ চেঁচিয়ে ওঠে—"বিধবা হইনি, কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় একাদশী করবো। এ-কথার ওপর তুমি আর কোনো কথা বলতে পারো দিদি?"

বরুণা আস্তে-আস্তে এগিয়ে তার পাশে দাঁড়ায়, তার মাথায় হাত রেখে শান্ত-কণ্ঠে বলে, "ছি, ও-রকম পাগলামী করতে নেই ভাই, তুমি ছেলে, তোমার কি এ-রকম করা সাজে? আমি বিধবা, আমায় এসব নিয়ম পালন করতেই হবে, নচেৎ—"

বলতে-বলতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়।

সোমেশ বললে, "কিন্তু দিদি, তুমি তো চিরদিন সমাজের গণ্ডীর বাইরেই কাটিয়েছো, তোমার জীবনের ক্ষেত্রও তো এতটুকু সীমাবদ্ধ নয়, তবে কেন তুমি এইসব ছোট-খাটো আইন-কানুন, আচার-বিচার মেনে চলবে? কেন তুমি চুল কাটলে, থান পরলে—কেন তুমি একাদশী করবে, হবিষ্যি করবে?"

বরুণা হাসলে, বললে, "কেন, তা যে আমিও জানিনা ভাই। চিরদিন আমি মানি নি, কোনোদিন যে থান পরবো, হবিষ্যি-একাদশী করবো তাও ভাবি নি। কিন্তু তাঁর যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে

মনে হলো—আমিও ফুরিয়ে গেছি। মনে হলো—তাঁর আত্মার তৃপ্তির জন্যে আমার এটুকু কষ্ট করা চাই, তাঁর স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখতে আমার চাই—ত্যাগ। ভোগ তো অনেকই করেছি ভাই, আজ তাঁর জন্যে নাহয় এতটুকু কষ্টই করলুম। ভগবানকে কোনোদিন মানিনি, কারণ তাঁকে দেখিনি, কিন্তু ওঁকে যে দেখেছি ভাই—"

বলতে-বলতে তার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল ঝরে পড়ে।

সইতে পারেনা সোমেশ, বরুণার এই রুক্ষ-মলিন মুখ, তার এই কৃচ্ছ্রসাধন সে সইতে পারেনা—তাই সে একদিন কাজের নাম ক'রে চ'লে গেছে। ব'লে গেছে, কিছুদিন পরে সে ফিরবে, এখন ফিরবে না।

বরুণার দিন এখানেই কাটে।

গ্রামের লোকেরা তার দাবি নিয়ে মাধব দাসের কাছে দাঁড়ায়—'পরেশের বাড়ী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। ওগুলো একেবারে অবৈধভাবে যে তিনি নিয়েছেন তা তারা জানে। বিধবার ভরণপোষণের ভারও তাঁকে নিতে হবে, নইলে সে যাবে কোথায়—দাঁড়াবে কার কাছে?'

মাধব দাস একেবারে জ্বলে ওঠেন—

"তার মানে? অবৈধভাবে লোকে বাড়ী, জমিদারী, সব-কিছু নিয়ে বছরের পর বছর ভোগদখল করতে পারেনা। আদালত খোলা আছে, পারে পরেশের বউ—নালিশ করুক।"

কথাটা বলেও তিনি শান্তি পাননা।

বরুণার সঙ্গে দেখা করবেন তিনি, তার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে তারপর তিনি এইসব লোকগুলোকে দেখে নেবেন।

এরা সব তাঁরই প্রজা, তবু আজও তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেয়না এ-ক্ষোভ তাঁর মন হতে দূর হয়না। এক-একবার মনে করেন তিনি এ-জমিদারী বিক্রি ক'রে দেবেন, কেবল মিল ও কারখানাগুলো থাকলেই তাঁর যথেষ্ট হবে। কিন্তু 'জমিদার'-নামের নেশা তাঁকে এমনভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে যে, কিছুতেই তিনি এ-জমিদারী হাতছাড়া করতে পারছেন না।

মিলের সিনিয়র-পার্টনার ছিল, গণেশলাল মিশ্র,—লোকটা দেনার জ্বালায় আত্মহত্যা করেছে বহুকাল আগে। এতদিন মাধব দাস জানতেন তার কোনো ওয়ারিস্ নেই, হঠাৎ কোথা হতে তার উত্তরাধিকারী এক ভাগ্নে এসে দাঁড়িয়েছে, হাইকোর্টে কেস উঠেছে, এতেও যে কি হবে তার ঠিক নেই।

মাধব দাসের মাথা ঘোরে।

এসব কথা কোনোদিনই চাপা থাকেনা। গোপন করার চেষ্টা সত্বেও গ্রামে প্রকাশ হয়ে গেছে। সপরিবারে তিনি গ্রামে এসে মাত্র পাঁচমাস যে বাস করছেন, লোকে বলে,—ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়েছে, তাঁর বালিগঞ্জের বিরাট অট্টালিকায় তাঁর নাকি আর প্রবেশাধিকার নেই। সে বাড়ী নাকি—গণেশলালের। মিলও শীগগির বন্ধ হয়ে যাবে, সঙ্গে-সঙ্গে অন্যসব কারখানাও।

যুদ্ধ মিটেছে—তবু অভাব ঘুচছে না, বরং আরও যেন ভীষণ হয়ে উঠেছে। অনেক বেকার, যুদ্ধোপলক্ষে মিলিটারীর

কাজ নিয়ে বেশ দু'পয়সা যেমন উপার্জ্জন করেছিল, খরচও করেছে তেমনি। তারা কেউ ভাবতে পারেনি যে, এত শীগগির যুদ্ধ মিটে যাবে, জাপান এত শীগগির মাথা নোয়াবে। অ্যাটম-বোমকে আজ এরা লক্ষ-মুখে অভিশাপ দিচ্ছে, হিরোসিমো ও নাগাসাকি ধ্বংস না হ'লে তো জাপান দাঁতে কুটো করতো না!

বেকাররা ফিরেছে স্বস্থানে, দু'দিনের বাদসা হওয়া শেষ হয়ে গেছে, আবার তারা খাওয়া-পরার ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠেছে। এই দুর্দ্দিনে পাটের কল, চালের কল এবং অন্য কারখানা-ক'টা যদি ভালোভাবে চলতো, মাধব দাসকে আজ পায় কে?

বরুণার কানেও একথা পৌঁছোয়।

রাধা এসে খবর দেয়—"শুনছো গো দিদিমণি, আমাদের জমিদারবাবু নাকি এবার লালবাতি জ্বালবে।"

বরুণা জিজ্ঞাসা করে—"তার মানে?"

রাধা হেসে বলে, "সব নাকি বিক্রি হয়ে যাবে গো। তা আর যাবেনা? কি সর্ব্বনাশটা করলে লোকের বলো তো? তোমারই সব নিয়ে আজ উনি জমিদার, অথচ বড়োবাবু কিনা পরের বাড়ীতে একফোঁটা ওষুধ না পেয়ে—"

অসহিষ্ণু বরুণা হাত তোলে, "আঃ, যেতে দে রাধা, যেতে দে। ওসব কথা বলিস নি। তোদের দাদাবাবু ওদের ক্ষমা ক'রে গেছেন, যাবার সময়ও ব'লে গেছেন—ওদের ভালো হোক। আমাকেও তাই বলতে দে।"

রাধা বলে, "কিন্তু, এই ঘরে থাকা কি তোমার পোষায় দিদিমণি? এই কাজকর্ম্ম করা—এসব কি তুমি পারো?"

বরুণা বলে, "আমি সব পারি রে, সব পারি। তিনি যদি এই ঘরকে স্বর্গ মনে ক'রে গিয়ে থাকেন, আমি পারবো না? তুই বলিস কি রে রাধা? আমি তোদের কাজ করি—সে যে তাঁরই কাজ। এই গাঁয়ের দশজনকে ভালোবেসে তাদেরই কাজ করবার জন্যে তিনি এখানে এসেছিলেন, আমি তাঁর বাকি কাজগুলো ক'রে যাচ্ছি—এইটেই যে আমার গৌরব, রাধা! তোদের ভগবানের কাছে বলিস, আমি যেন এই-কাজ করতে-করতে এখানে মরতে পারি, তোরা দশজনে মিলে তাঁকে যেখানে দাহ করা হয়েছে সেখানে আমাকেও দাহ করিস।"

রাধা আর একটি কথাও বলতে পারেনা, তার চোখ ভ'রে জল আসে। গলায় আঁচল জড়িয়ে সে বরুণার পায়ের কাছে মাথা নোয়ায়, রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "আমায় ওই আশীর্ব্বাদ করো দিদিমণি, আমি যেন কোনোদিন ওকে না হারাই।"

"আশীর্ব্বাদ—আশীর্ব্বাদ…"

বরুণা হাসে—"বোকা, আশীর্ব্বাদের কি মূল্য আছে রে আমার? তবু যখন বলছিস—আশীর্ব্বাদ করছি, খ্যাদাকে রেখে তুই যেন মরতে পারিস।"

শুনে, খুশী-মনে রাধা চ'লে গেল।

বরুণা ফিরলো পরেশের ফটোখানার দিকে।

প্রত্যহই এই ফটোর ওপর সে ফুলের মালা দেয়—ফুলদানীতে

সযত্নে ফুল সাজিয়ে দেয়, তারপর ধূপ-ধূনো দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে।

সে আশীর্ব্বাদ করলে, কিন্তু পরেশকে রেখে সে তো যেতে পারলে না! সুস্থ সবল স্বামীর কোলে মাথা রেখে সে যদি যেতে পারতো।

"ওগো বিপ্লবী-ভারতের নেতা, ওগো মুক্তিদূত, আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করো, আমার প্রেম নাও, আমায় তোমার কাছে ডেকে নাও, আমি যে আর একা থাকতে পারছিনা গো।"

বরুণার চোখ দিয়ে ঝরঝর্ ক'রে জল ঝরতে থাকে।

"কই গো বউমা, কোথায় আছো বাছা?"

অকস্মাৎ স্বর্গ হতে ধূলার ধরণীতে গড়িয়ে পড়ে বরুণা। মাধব দাস এসেছেন, ডাকছেন। ত্রস্ত বরুণা উঠে, চোখের জল মুছে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে—"থামুন—থামুন, আমি যাচ্ছি।"

মাধব দাস থতমত খেয়ে দাঁড়ান—"কেন, এগুবো না তার কারণ?"

বরুণা উত্তর দিলে, "এখানে আপনার আসা নিষেধ। আপনি বাইরে চলুন।"

কে যেন মাধব দাসের মুখের ওপর সপাং ক'রে চাবুক বসিয়ে দিলে। তাঁর মুখখানা প্রথমটায় বিবর্ণ হলো, তারপরই ক্রোধে বেগুনি হয়ে উঠলো।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন, "আমায় এতখানি অপমান করবার সাহস হলো তোমার—অ্যাঁ?"

বরুণা শান্তকণ্ঠে বললে, "অপমান আপনাকে করিনি, করেছি আপনার পৈশাচিক-বৃত্তিকে। আজ হঠাৎ আপনার এখানে আসায় আমি সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি, কারণ, আর তো কোনো স্বার্থ নেই, তবে কিজন্যে আপনি এসেছেন আমি তাই ভাবছি।"

গর্জ্জন ক'রে মাধব দাস বললেন, "যথেষ্ট। কিন্তু তুমি জানো—জোর ক'রে আমি এ-বাড়ীতে ঢুকতে পারি ?"

বরুণা দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "তার আগে আপনাকে আইন-সঙ্গত অনুমতি আনতে হবে কাকাবাবু। বিনানুমতিতে ঢুকলে আমি কেবল কৃষকদেরই নয়, আমার এ-গ্রামের সমস্ত ভদ্র-ইতর আর আপনার কুলি-মজুর সকলকেই সেকথা জানাবো, তারপর তার ফল যে মোটেই ভালো হবেনা সেটা আপনিও বেশ জানেন।"

সত্যিই মাধব দাস বেশ জানেন, এই মেয়েটির অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাঁর সর্ব্বনাশ হয়ে যেতে পারে—সে-ক্ষমতা এর আছে। শুধু এই গ্রামেই নয়, আশপাশের সকল জায়গার লোকই বরুণাকে মা ব'লে জানে, তার জন্যে তারা সব-কিছু করতে পারে।

বিবর্ণ-মুখ তুলে কি বলতে গিয়ে মাধব দাস চুপ ক'রে গেলেন।

বরুণা বললে, "আপনি যা বলতে এসেছেন তা আমি জানি। আমার দুঃখ-কষ্ট দেখে আমার ছেলেরা আপনার কাছে আমার ন্যায্য-প্রাপ্যের কথা জানাতে গিয়েছিল। আপনাদের ছেলে

যা ছেড়ে দিয়ে গেছেন, পলে-পলে অসহ্য যন্ত্রণা স'য়ে মৃত্যু বরণ করেছেন—"

• বলতে-বলতে বরুণার কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে ওঠে—

"তবুও তিনি, যা গেছে তার কথা একটিবার মুখে আনেন নি। আমিও তা চাইবো না। তাঁর আত্মা সুখী হোক, আমার ন্যায্য-প্রাপ্য আমি আপনাকে দান করলুম, নাহয় লেখাপড়া ক'রে আইনসঙ্গতভাবেই আপনাকে দেবো। যান, এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যান, এখানে আর দাঁড়াবেন না।"

মাধব দাস আস্তে-আস্তে বার হয়ে গেলেন।

রাধা এতক্ষণ নিজের ঘর হতে সব শুনছিল, এবার বেরিয়ে বললে, "উঃ, আবার চোট কতো! একবার বললে না কেন দিদিমণি, ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতুম।"

অন্যমনস্ক বরুণা কেবল বললে, "ছি!"

ছাব্বিশ

সেদিন সন্ধ্যার পর।

বনানী কেবলমাত্র বাড়ীতে ফিরেছে।

এসেই সামনের ঘরে যাকে ব'সে থাকতে দেখলে তাকে দেখবার আশা সে কোনোদিনই করেনি। সোমেশ এসেছে এবং তারই প্রতীক্ষায় ব'সে আছে।

বনানী ঘরে ঢুকতেই সোমেশ উঠে দাঁড়ালো। বনানী দেখলে,

সে কতকগুলো কাগজপত্র টেবিলে ছড়িয়ে নিয়ে বসেছিল, সেগুলো কোনোরকমে গুটিয়ে পকেটে পুরলে।

সোমেশ বললে, "অনেকক্ষণ ব'সে আছি বনানীদেবী, শুনলুম আপনি পাঁচটার মধ্যে ফিরে আসবেন। ঘড়ি দেখুন, এখন প্রায় আটটা বাজে।"

বনানী হাসিমুখে বললে, "হ্যাঁ। বড়ো দেরী হয়ে গেছে। বড়ো জড়িয়ে পড়েছিলুম কিনা! আপনি বসুন সোমেশবাবু, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

সোমেশ বসলো।

বনানী বললে, "আপনি কোথায় গিয়েছিলেন বলুন তো? বহুদিন আপনার কোনো খবরই পাওয়া যায়নি।"

সোমেশ হিসেব ক'রে বললে, "বহুদিন মানে, মাত্র পাঁচ ছ'টা মাস,—এ আর এমন খুব বেশীদিন কি।"

বনানী বললে, "আপনি একে বেশীদিন না বলতে পারেন, কিন্তু আমাদের কাছে খুব বেশীদিনই বইকি। যাক্, এতদিন ছিলেন কোথায়, শুনি?"

সোমেশ বললে, "যদি বলি, সাগর-পারে, সেটা কি খুব অসম্ভব মনে হবে বনানীদেবী?"

বনানী হেসে বললে, "তা কতকটা মনে হয় বটে, তবে আপনার কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। ধরুন, যদি বলি, সাগর-পারে গিয়েছিলেন ডক্টর রায়ের কাছে—তাহ'লে কি আমার অনুমান মিথ্যে হবে?"

একটু হেসে সোমেশ বললে, "হয়তো আপনার অনুমান সত্যি, কিন্তু সুজিত রায়ের 'কাছে' না ব'লে 'সন্ধানে' বললেই একেবারে নিখুঁত হতো ?"

বনানী বললে, "তা ঠিক। কাছে বলার চেয়ে সন্ধানে বলাই আইনসঙ্গত। তবে খোঁজ যে পাননি তাও ব'লে দিই— অর্থাৎ আইনসঙ্গতভাবে পাওয়া যায়নি।"

সোমেশ সে-কথার কোনো উত্তর দিলেনা, বললে, "উঃ, আপনার জন্যে আজ যা হায়রান হয়েছি তা বলবার নয়। আপনাদের বালিগঞ্জের বাড়ী গেলুম, আপনার নাম করতে সেখানে যা অপমান সইলুম—"

বনানীর মুখখানা অন্ধকার হয়ে উঠলো। সে বললে, "ওখানে যাবার আগে আপনি যদি দীপান্বিতার কাছে যেতেন তো আমার খোঁজ পেতেন। আমাদের বাড়ীর কেউ আপনাকে চিনতে পেরেছিল কি ?"

সোমেশ মাথা নাড়লে—"না। কারণ, চোখে ছিল কালো চশমা, এখন একটু গোঁফ রেখেছি, দাড়িও সামান্য গজিয়েছে, তারপরে মাথায় দিব্যি বাবরী-চুল এবং তার ওপর ছিল রীতিমত তুর্কি ফেজ, পরনে চোগা-চাপকান-পাজামা,—আপনার চোখকে শুধু ফাঁকি দিতে পারলুম না বনানীদেবী। আচ্ছা, কি-ক'রে আমার এ-বেশেও আপনি আমায় চিনলেন বলুন তো ?"

বনানীর মুখখানা মুহূর্তের জন্যে মলিন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে জোর ক'রে হেসে উঠে বললে, "যেমন করেই হোক,

আমার চোখকে যে ফাঁকি দিতে পারেননি' একথা তো স্বীকার করলেন? চিনতে পারলুম কেন, সে অনেক কথা যদি কোনোদিন সেদিন আসে তো শুনবেনখ'ন। আপাতত এটা ঠিক যে, আপনি সি-আই-ডিকে ফাঁকি দিয়েছেন, কিন্তু আমায় পারেননি। মনে করুন, এইমুহূর্তে যদি আমি ওদের জানাই—কতো পুরস্কার পাবো বলুন তো?"

সোমেশ মৃদু হেসে বললে, "নগদ পাঁচহাজার টাকা আমার জন্যে ঘোষণা করা হয়েছে তা আমি জানি। আপনার কাছে সেইজন্যেই এসেছি বনানীদেবী, শুনলুম আপনি নাকি ভারি কষ্ট পাচ্ছেন অর্থাভাবে। তাই ভাবলুম, এ-সময়ে এই পাঁচহাজার টাকা পেলে আপনার যথেষ্ট উপকার হবে কারণ, বাংলায় যখন ফিরলুমই, তখন ধরা হয়তো আমায় পড়তেই হবে। কাজেই, আপনার হাত দিয়েই যদি ধরা পড়ি, তবু তো পাঁচহাজার টাকা আপনি পাবেন!"

বনানী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সোমেশের পানে তাকিয়ে রইলো তারপরই তার চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝরঝর্ ক'রে অজস্র-ধারে জল ঝরতে লাগলো।

সোমেশ ব্যস্ত হয়ে ওঠে—"ওই দেখুন, অমনি আপনার চোখে জল আর রইলো না। ওকি—বনানী? বনানী?"

বনানী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগলো তার বুকের বোঝা আজ নেমে গেছে, কোনোমতে নিজেকে সে আর সংযত করতে পারছে না।

তার কথা সে রক্ষা করেছে, সোমেশের পথ সে নিয়েছে। আজ আর তার সে কলঙ্ক, সে গ্লানি নেই। আজ সে সোমেশের ব্যঙ্গের পাত্রী নয়—শ্রদ্ধার পাত্রী। পিতা তাকে ত্যাজ্য-পুত্রী করেছেন, ভায়েরা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছে, স্পষ্টই জানিয়েছে, এ-বোনের সঙ্গে সংস্রব রাখলে তাদের চাকরি থাকবে না।

বনানী চ'লে এসেছে তাদের কাছ হতে, বাগবাজারের দিকে একখানা ফ্ল্যাট নিয়ে আছে সে। একটা স্কুলে কাজ জোগাড় ক'রে নিয়েছে, তাতেই কোনোরকমে দিন চ'লে যায়।

সোমেশ সবই শুনেছে।

ছ'মাস আগে তার নামে গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা বেরিয়েছে, তার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে, কঠিন শাস্তি তার যে হবেই তা জানা-কথা। কিন্তু সোমেশকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সে যে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিল কে জানে।

তার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে, পাঁচহাজার টাকা। যে তার সন্ধান দেবে বা তাকে ধরিয়ে দেবে সে-ই পাবে এ-টাকা।

সোমেশ উঠে দাঁড়ায় বনানীর পাশে, তার মুখের হাতের ওপর হাত রেখে বলে, "ছি, কেঁদোনা বনানী, শোনো। আমার দিকে চাও।"

বনানী চোখ মুছে ফেলে রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "কিন্তু, কেন এলে তুমি বাংলায়? কেন এলে তুমি এখানে? তোমায় মিনতি করছি, তুমি চ'লে যাও। এখুনি, এইমুহূর্তে তুমি বাংলাদেশ ছেড়ে যাও, এখানে আর থেকোনা।"

সোমেশ একটু হেসে বললে, "যাবো বনানী, চিরদিনের জন্যে যাবো বলেই শেষ দেখা করতে এসেছি। সুজিত রাশিয়ায় চ'লে গেছে, দীপান্বিতাও আজ চ'লে যাচ্ছে সেখানে। পিসীমা আর পৃথিবীতে নেই, কাজেই, ওদের দুই ভাই-বোনকে বিন্দুমাত্র ভাবতে হবেনা কারও জন্যে। আমি দীপাকে রওনা ক'রে দিয়ে এসেছি, তোমার সঙ্গেও দেখা হলো, এবার শুধু একবার দেখা করবো দিদিমণির সঙ্গে, তারপর চিরকালের জন্যেই—"

সিঁড়িতে কার দ্রুত-পায়ের শব্দ শোনা যায়। বনানীর চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। দরজার সামনে ওই একটি মাত্র সিড়ি, আর কোনোদিক দিয়ে সোমেশকে বের ক'রে দেবার পথ নেই।

তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করবার সঙ্গে-সঙ্গে কে বাইরে হতে সজোরে ধাক্কা দেয়—"দরজা খোল্ বনানী—দরজা খোল্ বলছি।"

সজোর-ধাক্কায় দরজা খুলে যেতেই সদর্পে প্রবেশ করলে বনানীর ছোড়দা—বিভূদাস। তার হাতে রিভলভার।

"ছোড়দা!"

বনানী আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে।

"হ্যাঁ, আমি। আমি শুনেছি, সোমেশ এইখানে—এই বাড়ীতেই এসেছে।…এই যে…খবরদার সোমেশ, নড়বার চেষ্টা করোনা। হাত তোলো—"

সঙ্গে-সঙ্গে বিভূদাস রিভলভার উদ্যত ক'রে সোমেশকে লক্ষ্য করে।

সোমেশ হাসে, বলে, "হাত না তুললেও কোনো ক্ষতি হবেনা বিভূ, বিশ্বাস নাহয় দেখতে পারো, আমার কাছে একখানা ছুরি পর্য্যন্ত নেই।"

রিভলভার উদ্যত করেই বিভূদাস একটা হুইস্‌ল্ দেয়। বোঝা গেল, পুলিসে বাড়ী ঘিরে ফেলেছে, বিভূদাসের হুইস্‌ল্ শোনামাত্র তারা এসে পড়বে।

অসহায়ভাবে সোমেশ বললে, "আমি তোমার হাতের মধ্যে এসে পড়েছি বিভূ, দেখছি আমার এ ছদ্মবেশ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তবে, যদিও আমি এখন নিতান্ত অসহায়, একটা লাঠি বা ছোরা আমার কাছে নেই, তবু আমি আশা করছি—"

বলতে-বলতে সে বিদ্যুৎবেগে বিভূদাসের ওপর লাফিয়ে পড়ে, রিভলভারটা নিয়ে দু'জনে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়।

"দুড়ুম্!"

ফায়ার হয়···সঙ্গে-সঙ্গে বনানী চোখ মোদে···

তারপর যখন তাকায়, দেখতে পায়, বিভূদাস—তার ছোড়দা মাটিতে প'ড়ে। রিভলভারের গুলি তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করার সঙ্গে-সঙ্গে সে মারা গেছে। সোমেশ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হুইস্‌ল্‌টা খানিক দূরে প'ড়ে আছে, দ্বিতীয় সঙ্কেত করবার জন্যে কেবলমাত্র বিভূদাস প্রস্তুত হচ্ছিলো সঙ্কেত আর হলোনা।

"ছোড়দা?" বনানী একবারমাত্র আর্ত্তনাদ করেই থেমে যায়। মনে প'ড়ে যায়—নীচে পুলিস-বাহিনী প্রস্তুত, মাত্র আর-একটি সঙ্কেতের অপেক্ষা।

যে গেছে সে তো গেছেই, তার জন্যে আর-একজনকে বলি দিয়ে লাভ ?

"আমি তোমার দাদাকে খুন করেছি বনানী—"

কম্পিতকণ্ঠে সোমেশ বললে।

বনানী ব'সে পড়েছিল, উঠে দাঁড়ালো। তাহ'লে সে এখন কি করবে ? বনানী ভেবে পায়না এইমুহূর্ত্তে তার কর্ত্তব্য কি। কি করতে পারে সে এখন—কী ? কী ? কী ?...

সোমেশের কাছে এসে তার কাঁধের ওপর হাত রেখে বললে, না, তুমি খুন করোনি, গুলি ছুটে গেছে। তুমি যাও, শীগগির পালাও। ওই পেছন-দিককার পাইপ বেয়ে নেমে রাস্তায় পড়ো, প'ড়ে ছুটে পালাও, দেরী কোরোনা—যাও ! যাও !"

হতভম্বপ্রায় সোমেশকে হাত ধ'রে টেনে আনলে সে বাড়ীর পেছন-দিকে, যেখানে একটা লম্বা পাইপ ওপর থেকে নীচের দিকে নেমে গেছে। সোমেশ রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "কিন্তু, পুলিস যে এখুনি ঘরে আসবে বনানী, তুমি কি বলবে ?"

বনানী চাপা-স্বরে বললে, "যা বলবার আমি বলবো, তোমায় তার জন্যে ভাবতে হবেনা—যাও, এরপর পালাতে পারবে না।"

কম্পিত-হাতে বনানীর ঘর্ম্মশীতল একখানা হাত ধ'রে নিজের মুখের কাছে এনে সোমেশ একটা চুম্বন দিলে, তারপর পাইপ বেয়ে তর্‌তর্‌ ক'রে নীচে নেমে গেল। জন-বিরল পথে বেরিয়ে যাবার সময় একখানা হাত উঁচু ক'রে জানিয়ে গেল—'বিদায় !'

ফিরে বনানী ঘরে এলো—রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে।

বনানীর ছোড়দা। পথ বিভিন্ন হোক, তবু সে বনানীর ছোড়দা। ছোটবেলা হতে একসঙ্গে মানুষ, কতো মারামারি, কতো কাড়াকাড়ি, কতো হিংসা, দ্বেষ, ভালোবাসা, অভিমান—বনানীর ছোড়দা।

ফুলে-ফুলে বনানী কাঁদে। সিঁড়িতে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা যায়। দ্বিতীয় সঙ্কেত না পেয়ে, বিপদের আশঙ্কা ক'রে পুলিসদল—বিভূদাসের ভগিনীর বাড়ীতে প্রবেশ করছে।

বনানী চট ক'রে চোখ মুছে ফেলে।

"একি ?"

ইনেসপেক্টার শরৎবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—"একি, মিঃ দাস রিভলভারের গুলিতে মারা গেছেন ? কে গুলি করলে—কে ?"

হাতের কাছে পতিত রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে, ইনেসপেক্টারের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে, হাত দু'খানা এক ক'রে বনানী বললে, "আমায় বন্দী করতে আদেশ দিন মিঃ ইনেসপেক্টার, বিভূদাসকে হত্যা করেছি, আমি।"

"য়্যাঁ ? আপনি ?" ইনেসপেক্টার কথাটা বিশ্বাস করেন না।

দৃঢ়কণ্ঠে বনানী উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, আমি। আমি বিভূদাসের বোন। একদিন আমায় বাড়ী হতে বের ক'রে দিয়েছিল, সেই রাগে আমি হত্যা করেছি।"

অগত্যা পাশের কনেষ্টবলের দিকে ফিরে ইনেসপেক্টার ইঙ্গিত করতেই হাতকড়া নিয়ে সে এগিয়ে এলো।

———

সাতাশ

বরুণাও আর-সকলের মত শোনে।

অসুস্থ বরুণা, শরীর তার ভেঙে পড়েছে, নড়া-চড়ার ক্ষমতা নেই, কাজেই বিছানাতেই সে শুয়ে থাকে।

বনানী হত্যা করেছে তার ভাইকে—দেশের শত্রু, দশের শত্রু, বিভূদাসকে। কিন্তু, এও কি সম্ভব? বোন হয়ে সে ভাইকে হত্যা করবে?

বরুণা মাথা নাড়ে—না, না, এ হতে পারেনা, এ কখনো হতে পারেনা। সে বলুক সে তার ভাইকে গুলি করেছে, আমি বলবো, না। কখনো নয়। সে গুলি ক'রে নিজের ভাইকে কখনো মারতে পারেনা, এ অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব।

বিচার চলছিল।

মাধব দাস সপরিবারে কলকাতায় চ'লে গিয়েছেন। গণেশলালের ওয়ারিশ মামলায় জিতেছে, মিলের প্রধান-অংশের মালিক এখন সে—নিজে সে এখানে এসে বসেছে, মিল ও কারখানাগুলোকে নিজেই দেখা-শোনা করছে।

মাধব দাসের সাক্ষ্যের দিন তিনি কোর্টে হাজির হননি, আত্মহত্যা ক'রে তিনি সকল জ্বালা-যন্ত্রণা ও অপমানের হাত হতে নিস্তার পেয়েছেন।

এ-খবরও পেলে বনানী।

চোখে তার জল এলোনা, কেবল এত জোরে সে অধর দংশন
রলো যে, রক্ত বেরিয়ে পড়লো।

বিচার শেষ হলো। হলো তার সশ্রম কারাবাসের দণ্ড।
র্ঘ সাতবছরের জন্যে বনানী চ'লে গেল জেলের ভেতরে।

সকল সংবাদপত্রে তার নাম প্রকাশিত হলো ফটো-সমেত।

এই হতভাগিনী মেয়েটার কথা ভেবে বরুণার চোখে জল
াসে।

বেশই ছিল সে, কেন সে সোমেশের কথা শুনলে, কেনই-বা
স দেশসেবা-ব্রত নিলে!

সোমেশের খবর সে অনেকদিন পায়নি, সেজন্যে উৎকণ্ঠিত
য়েছিল বড়ো কম নয়।

বরুণা শুনলে, সোমেশ এসেছিল, কলকাতা পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল,
স বলেছিল, বনানী এবং বরুণার সঙ্গে দেখা ক'রে সে ফিরবে।
ীপান্বিতার পত্র এসেছে বরুণার নামে, রাশিয়ার পথ হতে।
টিশ-এলাকা হতেই সে পত্র পোষ্ট করেছে।

দীপান্বিতাই খবর দিয়েছে, সোমেশ এসেছে—যত শীঘ্র পারে
স যেন চ'লে আসে, দেশ তার পক্ষে নিরাপদ নয়। যেদিন
দেশ তাদের আসার উপযুক্ত হবে, সেদিন তারা তিন ভাই-বোনে
ফিরে আসবে—সেইদিনের অপেক্ষায় তারা থাকবে।

বরুণা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে—

সোমেশ এসেছে—ধরা পড়েনি তো? কই, তার এখানে তো
আসেনি সে?

হারাধন সেদিন যখন এসেছিল, তাকেই জিজ্ঞাসা করলে বরুণা—"সোমেশ কি এর মধ্যে কোনো খবর নিয়েছে হারাধন?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হারাধন কেবল মাথা নাড়ে।

প্রতিদিনকার সংবাদপত্র পায় বরুণা, সমস্ত খবর সে খুঁটিয়ে পড়ে, সোমেশের নাম-গন্ধও কিছুতে নেই।

কে জানে, সোমেশ হয়তো চ'লে গেছে, দেখা সে ক'রে গেলনা, তার বাড়ী-ঘরের কোনো ব্যবস্থাও ক'রে গেলনা। হারাধন প্রায় অথর্ব্ব হয়ে পড়েছে, সেই-বা ক'দিন বাঁচবে—বরুণারও আর দেরী নেই। একবার যদি সোমেশ আসতো, বরুণা তার কাছ হতে শেষ-বিদায় নিতে পারতো। রাগ ক'রে সে চ'লে গেছে,—তার মুখখানা আজও বরুণার মনে পড়ে।

চিরদিনের অশান্ত সে। ঘর তার জন্যে নয়। দু'দিনের জন্যে এসেছিল, আবার চ'লে গেল সব ফেলে। এমনিই সে আসা-যাওয়া করবে—টিকে সে কোনোদিনই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থাকতে পারবে না। বাইরে রয়েছে তার বিশাল জগত, সে-জগতে আছে অফুরন্ত কাজ,—এতটুকু নিয়ে আত্মহারা হয়ে থাকা সোমেশের কোষ্ঠিতে নেই।

শ্রাবণের আকাশ মেঘে ঢেকে আসে, মাঝে-মাঝে ঝরঝর ক'রে বৃষ্টিধারা ঝরে পড়ে। ঘরের ওপাশে কদম্বফুল রাশী-রাশী ফুটে ওঠে গাছ আলো ক'রে, সুন্দর মিষ্টি গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দূরের ওই ছোট-ডোবাটায় কানায়-কানায় জল ভ'রে ওঠে—

বরুণা অর্দ্ধশয়নাবস্থায় সেদিকে চেয়ে দেখে, স যাচ্ছি, আ

কয়েকটা লাইন তার মনে হয় :

'ভোর বেলা যে খেলার সাথী, ছিল আমার কাছে,

মনে ভাবি, তার ঠিকানা তোমার জানা আছে ;

তাই তোমার ওই সারি গানে

সেই আঁখি মোর মনে আনে,—'

কোথায় গেছে খেলার সাথী হারিয়ে,—বরুণা তাকে খুঁজে ফিরছে শ্রাবণের ঘন-ধারার মধ্যে—দূর হতে ভেসে-আসা নদীর বুকে—মাঝির গানের মধ্যে। সে বার-বার ডাকছে :

'ওগো আমার শ্রাবণ-মেঘের খেয়া তরীর মাঝি—

অশ্রুসজল পূরব হাওয়ায় পাল তুলে দাও—

পাল তুলে দাও আজি।'

পরেশের সেই কবিতাটা মনে হয়, বরুণা মাথার কাছ হতে 'চয়নিকা'খানা নেয়, আষাঢ়-কবিতাটা খুঁজে বার করে :

'শোন শোন ওই, পারে যাবে ব'লে

কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে,

খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে আজিরে।'

বরুণা আপনাকে হারিয়ে ফেলে—তার কণ্ঠস্বর ক্রমে-ক্র জড়তা ছাড়ায়—উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে ওঠে। বাইরে সন্ধ্যার অনেক-আগে সন্ধ্যা নেমে আসে, একমাত্র জলধারার ঝরঝর্ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ পাওয়া যায়না।

"দিদি—দিদিমণি ?"

হারাধন শোনা যায়—

বরুণা ওঠবার চেষ্টা করে—"কে ?"

"আমি সোমেশ, দিদি।"

সোমেশ এসে তার পাশে ব'সে পড়ে, আস্তে-আস্তে তার পায়ে মাথা ঠেকায়।

"সোমেশ, সোমা—সোমা—"

বরুণা তার মাথায় হাত রাখে, উদ্বেলিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে "সত্যি এসেছো সোমা,—কি ক'রে এলে ? উঃ, কি ভেজাই ভিজেছো, সারা গা-মাথা, দিয়ে জল ঝরে পড়ছে যে।"

অপ্রস্তুত সোমেশ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে, "তাইতো তোমার বিছানাটা ভিজিয়ে ফেললুম যে দিদি! রাধাকে ডাকি সে ভিজে-বিছানাটা বদ্‌লে দিয়ে যাক।"

বরুণা বললে, "এমন-কিছু বেশী ভেজেনি যাতে বদ্‌লাতে হবে। তুমি এই টুলখানাতে ব'সো সোমা, আলোটা রাধা কখন চুপি-চুপি দিয়ে গেছে, ওটা বাড়িয়ে দিয়ে সামনে রাখো তোমায় অনেকদিন দেখিনি, একবার দেখি। আর তো দেখতে পাবোনা ভাই!"

সোমেশ আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে বিষণ্ণ-হেসে বললে, "কিন্তু আজ আমায় দেখে চিনতে পারবেনা দিদি। দেখছো না ? দাড়ি গোঁফ, মাথার চুল, চশমা, তারপরে এই বেশ! রাতের অন্ধকারই শুধু নয়, শ্রাবণের বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে এসেছি দিদি, শুধু তোমায় একবার দেখে যাবো, আর-কিছু নয়। জানি তোমার সঙ্গে আর

থা হবেনা দিদি, আমি চিরকালের মতন চ'লে যাচ্ছি, আর ফিরবো না।"

বরুণা নিঃশব্দে তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়, অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপ ক'রে থাকে।

তারপর বরুণা কথা বলে—

"দীপা এখানে আমার নামে তোমায় পত্র দিয়েছে। আমি ঐই পত্রে জানতে পারলুম তুমি এসেছো, বনানী আর আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার নামে পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে তাও আমি জানি, তোমার জন্যে তাই ভাবছিলুম সোমা। বেচারা বনানীর জন্যে আজ বড়ো দুঃখ হয়। আমি জানি সে হত্যা করেনি, তার ভাইদের সে বড়ো ভালোবাসতো, কিন্তু তবু দেখ, সে নিজে স্বীকার করেছে যে—"

সোমেশ আর্দ্রকণ্ঠে বললে, "সে মিথ্যে কথা বলেছে দিদি, বিভূকে হত্যা করেছি—আমি।"

"তুমি—তুমি সোমা?"

বরুণা কেন যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে, সোমেশের হাত তার হাত হ'তে খসে পড়ে।

সোমেশ একটু হাসলে, বললে, "হ্যাঁ দিদি, আমি। হোক সে শত্রু, তবু তাকে মারবার ইচ্ছে আমার ছিলনা, জেনে-শুনে আমি হত্যা করিনি। আমার অজ্ঞাতে রিভলভারের গুলি আমারই হাত হতে ছুটে গিয়ে তার বুকে বিঁধে যায়।"

রুদ্ধকণ্ঠে বরুণা বলে, "কিন্তু, বনানী!"

সোমেশ বললে, "আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম দিদি, ভেবেছিলুম দেখা ক'রে এখানে চ'লে আসবো, তোমায় একবার শেষ-দেখা দেখে চ'লে যাবো। হয়ে গেল অন্যরকম। বিভূ সন্ধান পেয়ে, পুলিস নিয়ে ওখানেই আমায় ধরতে গিয়েছিল। আমি তার হাতের রিভলভার কেড়ে নিতে গিয়েছিলুম, বনানীর সামনেই সে তার রিভলভারের গুলিতে হত হয়েছে দিদি!"

হাত দু'খানা মুখের ওপর চাপা দিয়ে বরুণা নিঃশব্দে প'ড়ে থাকে।

সোমেশ ডাকে, "দিদি?"

হাত নামিয়ে বরুণা তার পানে তাকায়।

সোমেশ বললে, "আমায় যে এখুনি চ'লে যেতে হবে দিদি, পুলিস আমার পেছনে এ-পর্য্যন্ত আসছে। আমার যে অনেক কাজ এখনও বাকি আছে।"

বরুণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "বনানী নিজে স্বীকার করলে, সে তার সহোদর-ভাইকে হত্যা করেছে—তুমি তাকে এ-অপবাদ, এ-শাস্তি হতে বাঁচাতে, সত্যিকথা বলতে পারলেনা সোমা? আমি যে শুধু সেইকথাই ভাবছি। একটি মেয়ে, সে তোমার অপরাধ নিজের মাথায় তুলে নিয়ে দীর্ঘ দশবছরের জন্যে জেল খাটতে চ'লে গেল, আর তুমি—"

তার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল।

সোমেশ উঠে দাঁড়ায়, বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে হাত দু'খানা রাখে, তার চোখে আগুন জ্বলে—